শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

(উপন্যাস)

সুশীল রায়

প্রণীত

শ্রী পাবলিশিং কোম্পানী

৩৭-৭, বেনেটোলা লেন, কলিকাতা

প্রকাশক : অনিলচন্দ্র রায়
'মানস-মন্দির', রাজসাহী

শ্রীমতী পঙ্কজ সমীপেষু

প্রথম সংস্করণ ... ভাদ্র, ১৩৪৮ সাল

মূল্য দেড় টাকা

ক্যালকাটা ইউনাইটেড প্রিণ্টারস্ লিমিটেড, ৪৫-এ, মতি শীল ষ্ট্রীট হইতে
মণীন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

৺অনিলা সেন

৺সরোজকুমার মজুমদার

১৩৪১ (ইং ১৯৩৪) সালে আমার প্রথম উপন্যাস 'একদা' প্রথম প্রকাশিত হয়। 'একদা'র নায়িকা পঞ্চমীকে আপনারা পাদপ্রদীপের সামনে মুখোমুখী পেয়েছিলেন। এ-বই সে-ই নায়িকাকে কেন্দ্র ক'রেই লেখা। তবে, এখানে সে আগাগোড়া নেপথ্যবাসিনী। এই সঙ্গে একটা কথা ব'লে রাখি: একটি মাসিক পত্রে যখন এই বইটি ধারাবাহিকভাবে বের হচ্ছিল, তখন জনকয়েক পাঠক লিখে ও মুখে আমার কাছে জানতে চান, এ-উপন্যাসের কাহিনী কোনো সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে গঠিত কি না। তখন তাঁদের কোনো জবাব দেওয়া হয়নি। এই সুযোগে আজ বলা দরকার-যে কোনো কাহিনীই সত্য হয় না, যদিনা সত্যের ওপর তার ভিত্তি থাকে। তবে, কল্পনাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হ'য়েছে বেশি।

এখানে আর একটি সামান্য কথা লিখে রাখা প্রয়োজন। এই বই যখন লিখতে আরম্ভ করি তখন আমার দুই নিকটআত্মীয় আবাল্য-সহপাঠী ও পরমবন্ধু অনিলা সেন ও সরোজকুমার মজুমদার জীবিত ছিলো। পাণ্ডুলিপির খানিকটা তারা দেখে গেছে। অনিলা ছিলো আমার লেখার সমঝদার আর সরোজকুমার ছিলো সমালোচক। এই দুই জনের মতামতের ওপর আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিলো। কারণ, অনিলা খাঁটি কবি: আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত কবিতার মাসিকপত্র জীবাণু অনেকটা তার লেখার ওপরই নির্ভর করতো; আর সরোজকুমার তার সাহিত্যবোধের পরিচয় দিয়েছে প্রবাসী বিচিত্রা ইত্যাদি পত্রে কয়েকটি অপূর্ব গল্প লিখে। এই দুই হিতাকাঙ্ক্ষী সমঝদার ও সমালোচকের পরস্পর-বিরোধী মতামত আমার লেখক-জীবনের মূল্যবান্ ঐশ্বর্য ছিলো। কিছুকাল আগে মাস তিনের

ব্যবধানে দু'জনেই নেহাৎ অকালে হঠাৎ মারা যায়। নিজের ব্যক্তিগত ক্ষতির কথা তুলে লাভ নেই; তবে, তারা এই বইটা শেষ দেখে যেতে পারলে আমার ভালো লাগতো। অসম্পূর্ণ ভাবেই লেখাটি কিছু দিন প'ড়ে থাকার পর আজ শেষ হ'য়েছে—এ-বই আজ তাদের নামেই উৎসর্গ করলাম।

বালিগঞ্জ,
জন্মাষ্টমী, ১৩৪৮

স্থু. রা.

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

পত্রাকার উপন্যাস

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু,

যদি তোমার অত অজস্র প্রশ্নের জবাব দিতে হয়, তাহ'লে তোমাকে সবুর ক'রতে হবে।

আমার মতো এমন-একটি মানুষের ওপর তোমার মতো অমন-একটি মেয়ের এত আক্রোশ কেন, তা আমি জানিনে। পৃথিবীতে যত রকমের প্রশ্ন আছে সব উদয় হবে তোমারি মনে, আর তার জবাব দেওয়ার জন্যে দায়ী হ'তে হবে আমাকেই? আমি ভেবে পাই না, পঞ্চমি, কেন তুমি আমাকে অনবরত এত জিজ্ঞাসার-সূঁচ্ ফোটাও। তবে, পাত্র-বিশেষের হাতের চিম্‌টিটাও বড্ড মিষ্টি লাগে, এই যা রক্ষে।

আমি বলি, যদি জবাবই তোমার দরকার, তবে দূরে ব'সে থেকে লাভ? তোমার সেই টাঙাইলে এমন-কী মধু আছে জানিনে, যা ছেড়ে তুমি কিছুতেই আমাদের এই বিষময় কলকাতার মাটিতে পা ফেল্‌তে চাও না। মুখোমুখী ব'সে কি টুকিটাকি কথা হ'তে পারে না? যাক্ গে, যা ভালো বুঝবে, তাই ক'রো।

তোমার জিজ্ঞাসার জবাব তাহ'লে দিতেই হবে, নইলে তুমি রেহাই দেবে না আমাকে, পত্রাঘাতে বিব্রত ক'রে তুলবে। তা যদি হয়ই, তবে সবুর করো— আমি ধীরে ধীরে একে একে এগোই।

কৌমুদী সম্বন্ধে এর আগে চিঠিতে আমি যা লিখেছি, তাতে তুমি তার জন্যে নিশ্চয়ি দুঃখিত। আমিও-যে দুঃখিত নই, তা নয়। হঠাৎ সে-যে অমন ভাবে নিশ্চিহ্ন হবে, একথা আমি কল্পনায়ও কেনো দিন ভাবতে পারিনি। কিন্তু যখন সত্যিই সে মারা গেলো—তখন বুঝলাম, আমাদের কল্পনাশক্তি কত

ক্ষীণ, তার বিস্তার কত সঙ্কীর্ণ। তার এই আকস্মিক অপমৃত্যুর জন্যে অনেকে তাকে বাহবা দিচ্ছে বটে, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আমি সে-দলে যোগদান করতে পারছি না। তার কারণ, কৌমুদীর জন্মের থেকে তার সব কথাই আমার জানা। আমার সন্দেহ হয়, সে আত্মঘাতী হ'য়েছে তার সীমাহীন পতিব্রতার জন্যে নয়, এ হচ্ছে তার স্বকৃত অপরাধের নিষ্ঠুরতম একটি শাস্তি। কেন? সেই প্রশ্নের উত্তরই আজ দিতে বসেছি। একটা উপন্যাসের জন্যে প্রকাশক তাগাদা দিচ্ছে, দিক্। আগে চিঠিটা শেষ ক'রে নিই।

যে-কাল আজ সাত বছর আগে রওনা হ'য়ে আমাদের ছেড়ে গেছে, যদি রুদ্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে তাকে ধরতে পারি তবে সেখানে আমরা পাব অতি স্নিগ্ধ ও নরম একটি পৃথিবী! এবং তার সঙ্গে কৌমুদীকে তো পাবোই, আরো পাবো বিজন বলে আর একটি ছেলেকে। একে তুমি চেনোনা, চেনার কথাও তোমার নয়। যদি একে চেনাতে হয়, তবে আমাকে সাত বছর আগের পুরোনো ইতিহাস টানতে হবে।

মনে মনে ছবি এঁকে নাও একটা বাড়ির। সাম্নে তার খানিকটা নগ্ন মাঠ, রাস্তা থেকে মাঠটিতে তেরছাভাবে পায়েহাঁটা পথের শাদা দাগ প'ড়েছে। এই পথটির প্রান্ত এসে ঠেকেছে নূনে-খাওয়া এক প্রাচীরের গায়ে, তার সঙ্গে একটা দরজা, দরজা খুললেই সোজা ইঁট-বসানো পথ, ইঁটের গায়ে শ্যাওলা আর তার ফাঁকে ফাঁকে সবুজ ঘাসের সকাতর দৃষ্টি। তার দু'পাশে আগাছার মতো বেড়ে উঠেছে অজস্র গাছ, তার মধ্যে ফুলেরও কয়েকটা। থাকে-থাকে গায়ে-গায়ে বসানো এই ইঁটের শেষে তুমি পেলে একটি করগেটের চৌচালা ঘর। মেঝেটা পাকা নয়, কাঁচাও নয়, কাঠের পাটাতন দেওয়া। তার ফাঁক দিয়ে নিচে তাকালে নির্ঘাৎ তুমি ভয় পাবে। কারণ, আমি জানি, তোমার সাপাতঙ্ক বেজায়। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হ'য়েও সাপকে তুমি ডরাও বড্ড। কিন্তু এর নিচে

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

সাপ থাকলেও চাক্ষুষ পরিচয় কারো ঘটেনি কোনোদিন সরীসৃপ-জাতীয় কোনো জানোয়ারের সঙ্গে; তবে, মাটি থেকে কি-রকম সব লতা মেঝে পর্যন্ত ঝিলবিল ক'রে উঠেছে, কাঠের ফাঁক দিয়ে যার দু'একটা অবাধ্য সবুজ ডগা ঘরের মধ্যে ট্রেস্‌পাস্‌ ক'রেছে। দেওয়ালগুলো তৈরি বাঁশের ঝাঁপ দিয়ে। জান্‌লা আছে সবসুদ্ধ চারটে, আর প্রবেশপথ বাদেও আছে একটি দরজা পাশের ঘরে যাবার জন্যে। সেই ঘরে এই সংসারের হয় রান্না আর বান্না। সে ঘরের মেঝের ঠিক মাঝখানে কাঠের তক্তা গোলাকার-ধরণের ক'রে কাটা, রান্না ক'রে কিংবা বাসন মেজে জল ফেলার জন্যে। সব জল নির্বিবাদে জম্‌ছে তিন হাত নিচের জমিতে, আর আগাছার জোগাচ্ছে খোরাক।

সেই গোল গর্তের হাত তিন দূরে তোলা-উনুনে বালি জাল দিচ্ছে কৌমুদী। তার মুখে ছায়া প'ড়েছে প্রগাঢ় বিষাদের, সঙ্গে আতঙ্কেরও ছবি ফুটেছে নিখুঁৎ। পেতলের প্যান্‌এ ঈষৎ শাদা তরল পদার্থটি একটি পেতলেরই হাতা দিয়ে সে অনবরত নাড়া দিচ্ছে, হাতার বাটিতে ক'রে করছে ঢালা-উপুড়।

পাশের ঘর থেকে সকরুণ ও সকাতর উক্তি এলো, কুমু—উ।

কৌমুদী একটা নিশ্বাস ফেলে ব'ললো, যাই। ক্ষিদে পেয়েছে তো? তারি যোগাড় করছি। এই এলাম ব'লে।

শরৎ কালের নিস্তব্ধ সকাল। ঘরের পাশের ন্যাড়া নারকেল গাছের মাথায় বসে একটা কাঠ-ঠোকরা বেসুরো ঠক্‌ ঠক্‌ ক'রে এই নৈঃশব্দকে আরো গাঢ় ক'রে তুলেছে। আর শোনা যায়, বহুদূরের কোন্‌ এক বাড়িতে একটা শিশুর একটানা চীৎকার, অস্ফুট।

কিন্তু কৌমুদীর কানের পর্দায় আঘাত লাগে একটা গাঢ় নিশ্বাসের, আর তার সঙ্গে অতি ক্ষীণ মৃতপ্রায় আর্তনাদ শুনতে পায় সে স্পষ্ট।

কৌমুদী নিজে থেকেই ব'ললো এবার, আর দেরী নেই! একটু সবুর করো।

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

পাশের ঘর থেকে সাড়া এলো, আচ্ছা।

অকস্মাৎ এই সমস্ত গুমট স্তব্ধতা ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে চুরমার হয়ে ভেঙ্গে গেল। অনতিদূরের রাজবাড়ির পেটা-ঘড়িতে বেলা বেজে উঠলো ন'টা।

কৌমুদী নিশ্বাস ফেললো। কাপড়ের আঁচল জড়ো ক'রে প্যানটির দু'কিনার দু'হাতে ধ'রে ঝাঁপের দরজা পা দিয়ে ঠেলা দিয়ে সে চ'লে এলো এ-ঘরে। ঘরে ঢুকেই সে আঁৎকে উঠলো প্রায়: একি, তুমি আবার উঠে ব'সেছো? হাজারবার ডাক্তারবাবু বারণ ক'রে গেছেন! নাঃ, তোমাকে নিয়ে—

রুগী তখন উবু হ'য়ে বিছানার ওপর ব'সে ধুঁকছে। কৌমুদী বিছানার পাশে ত্রস্ত হাতে প্যান্‌টি রেখে তাড়াতাড়ি দু'হাতে রুগীকে ধ'রে ব'ললো, শোও।

তারপর কৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ করলো: আমাকে আর কত রকমে জ্বালাতন করবে, ব'লতে পারো? যা তোমাকে বারণ করা যাবে—

রুগী মৃতের মতো হাস্‌লো: জ্বালাতন? আর বেশী দিন না!

কথাটা সত্যি হ'লেও এবং কৌমুদী মনে মনে এ-সত্য জান্‌লেও, তার কানে কথাটা বড় নিষ্ঠুর ও অসহনীয় শোনালো। সহসা তার সমস্ত মুখ বিবর্ণ হ'য়ে উঠলো, তার বুকের মধ্যে গর্জন ক'রে উঠলো সহস্র শার্দূল, তার স্নায়ুর রক্তস্রোতে জেগে উঠলো ঢেউ।

কৌমুদী রুগীর কপালে হাত বুলাতে বুলাতে ডাক্‌লো, বাবা!

শেষ-রাত্রের ক্লান্ত দীপ-শিখার মতো প্রভাহীন চোখে মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন সনাতন।

আশ্চর্য মনের জোর এই সনাতনের। আজ এই মৃত্যুশয্যায় শুয়েও তিনি নিজে তো হতাশ হন্‌ই নি, মেয়েকেও তিনি সর্বদা উৎসাহিত ক'রে সজাগ রাখছেন। কিন্তু মনের জোর সব সময় সমান থাকে না, রোগের যন্ত্রণা যখন বেশী ক'রে খোঁচা দেয়, তখন তাঁর অজানিতেই মনের লাগামে কখন-যেন একটু

আলগা পড়ে। এই অসতর্কতার স্থযোগে তাঁর হতাশা অমনি মেয়ের কাছেও ধরা প'ড়ে যায়।

প্রবাদ, আজের এই দুর্বল অসহায় সনাতন নাকি এক কালে দারুণ দুর্দান্ত ছিলেন! এ-সত্যের পরিচয় তাঁর জীবনের ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে ইতিহাসের অবতারণা আপাততো অনাবশ্যক।

সনাতন মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মনে মনে হাসলেন, বললেন, ছিঃ, কাঁদিস্ কেন? চোখ মোছ্। রুগীর সাম্নে ব'সে কি কাঁদতে আছে? তাহ'লে রুগী ভাবে, তার বুঝি হ'য়ে এসেছে। যদি-বা তার জীবনের আশা থাকে, এমন ভাবে কাঁদলে সে-আশাও—ছিঃ, কাঁদিস্ না! আবার তুই ফুঁপিয়ে উঠলি? একেবারেই পাগোল। দে দে, আমাকে খেতে দে। ক্ষিদেয় যে নাড়ি জ্ব'লে গেল, কুমু!

একটানা এতগুলো কথা ব'লে সনাতন হাঁপাচ্ছিলেন। কৌমুদী চোখের কোণ পরিষ্কার ক'রে বাটিতে বার্লি ঢেলে সনাতনের মুখের কাছে ধ'রলো। সনাতন উঠে ব'সতে গেলে কৌমুদী বাধা দিয়ে ভিজা গলায় বললো, উঠোনা। চিৎ হয়ে শুয়ে হাঁ করো, আস্তে আস্তে ঢেলে দিচ্ছি।

কিছুটা গ্রহণ ক'রেই সনাতন মাথা নাড়লেন। কৌমুদী বাটি সরিয়ে নিলো।

এমন সময় বাইরের দরজার কব্জায় মৃদু আর্তনাদ শোনা গেলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে ইট্-বসানো রাস্তায় জুতার শব্দ উঠলো বেজে।

তাড়াতাড়ি কৌমুদী গায়ের কাপড় গুছিয়ে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তৈরী হ'য়ে নিলো। এবং সনাতনের বিছানার চাদর টেনে বর্ণহীন তোষকের কোণ দিলো ঢেকে।

ডাক্তারবাবু সরাসরি চ'লে এলেন ঘরে। মাথার হ্যাট বোগলদাবা ক'রে বিছানার পাশের ছোট্ট মোড়ায় তিনি তাঁর আসন নিলেন। এবং কাঠের মেঝের ওপর চিৎ ক'রে রাখলেন তাঁর শোলার টুপি।

কৌমুদীর দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসিতে মুখ উজ্জ্বল ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন ? রুগী কেমন ?

সংক্ষিপ্ত ভাবে সঙ্কুচিত জবাব দিলো কৌমুদী : একই রকম।

এবার রুগীর দিকে তাকিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, খেতে পারছেন, না, গলায় খুবই লাগছে। ক্যান্সারের তো ওই এক বিষম ল্যাঠা। খেতে পর্যন্ত দিতে চায় না।

একটু থেমে ডাক্তারবাবু বললেন, আর আপত্তি করবেন না, সনাতনবাবু। আপনি হাসপাতালেই চলুন। মিছামিছি এখানে এই মেঝের ওপর একলা পড়ে থেকে লাভ কী ? ওখানে গেলে চিকিৎসারও সুবিধে হয় অনেক !

সনাতন কোনো উত্তর না দিয়ে কাৎ হয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন। কৌমুদী চোখ নিচু ক'রে চুপচাপ ব'সে রইলো।

ডাক্তারবাবু এবার কৌমুদীকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, আপনিও আপত্তি করবেন না। হাসপাতালে কেন-যে আপনাদের এত আতঙ্ক, জানিনে। আমি ব'লতে পারি, ওখানে গেলে আপনি সুস্থ হ'তে পারবেন খুব তাড়াতাড়ি। এখানে থাকলে, বুঝতেই তো পারছেন, অযথা আপনাদেরও টাকা খরচ হ'চ্ছে, আমাদের দিক থেকেও ত্রুটী হ'চ্ছে অনেক। হাসপাতালের রুগী ফেলে ঠিক দরকারের সময় হয়ত' এসে পড়তে পারিনে ! আপনি চলুন, চলুন। আমি আজ এই কথা বলতেই এসেছি।

সনাতন একটু কাশলেন, তারপর বললেন, কিন্তু কৌমুদী একা এখানে থাকবে কেমন করে ?

একটা বুড়ি ঝী রেখে দিন্ ! সেইটেই সুবিধে।

অনেক দিনের অনেক আপত্তি আজ হার মানতে বাধ্য হ'ল। শেষ পর্যন্ত সনাতন হাসপাতালেই চললেন। কৌমুদী তার জীবনের এই নতুন সঙ্গীহীনতার কথা ভেবে মনে মনে অনেক-রকমে শঙ্কিত হ'লো। কিন্তু উপায় নেই, চারদিক

থেকে ভেবে দেখতে গেলে হাসপাতালে পাঠানো অবশ্য খুবই সঙ্গত। পোস্টাফিসের পাশ বইতে যে-টাকা ছিলো, তা ভেঙে খরচ ক'রতে ক'রতে প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। আরও কিছুদিন এই হারে খরচ হ'লে শেষে চোখে ধোঁয়া দেখতে হবে। সনাতনের নিজের যখন আজ আর আপত্তি নেই, কৌমুদী তার নিজের হাজারো রকমের অমতকে নির্বিবাদে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠা ক'রলো না। তিন-কুলে তাদের আছে কে?—যে এই দুর্দিনে সহায়তার জন্যে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসবে। এক সনাতনই তো তার সম্বল। আর যে যেখানে আছে, সকলকেই সনাতন আজ অনেকদিন আগে বর্জন ক'রে নিজের পথ তৈরি ক'রে অনেক দূরে এসে পৌঁছে গেছে।

সেই ইতিহাসটাই এবার তুমি শোনো, পঞ্চমি। এদিকে সনাতনের হাসপাতালে চিকিৎসা হ'তে থাক্, আর কৌমুদীর কাছে এসে থাকুক্ স্বনামধন্যা গোলাপদি তার পরিচারিকা রূপে।

সনাতনের গানের গলা ছিলো অদ্ভুত! যে-কোনো আসরে যখন-তখন সে যেমন-তেমন গান গেয়ে সকলকে তাক্ লাগিয়ে দিতে পারতো! শিক্ষা-গুরু ব'লে সে কাউকে জীবনের কোনো কাজেই মানেনি।

কেউ যদি তার গানে মুগ্ধ হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রতো, খোকা, তুমি গান শেখো কার কাছে?

সনাতন প্রায় চম্‌কে উঠতো যেন, ব'লতো, শিখ্‌বো কী? গান আবার শিখ্‌তে হয় নাকি? একি অ আ ক খ?

সনাতনের বন্ধন ছিলো না কিছুই। তার শৈশবে প্রথম জ্ঞান হওয়ার পর সে দেখ্‌লো: একটি বাড়িতে সে লালিত আর পালিত হ'চ্ছে কিন্তু সে-বাড়ির কারুরই তার ওপর তেমন কোনো মমতা নেই! সনাতনও কাউকে তোয়াক্কা না ক'রে একা একা নির্বিবাদে বেড়ে উঠলো, এবং বাড়ির মালিকের হুকুম পেয়ে তাঁকে সে ডাকতে আরম্ভ করলো: মামা।

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

সনাতনের মামী যিনি, তিনি সনাতনকে অযথা লাঞ্ছনা করতেন ব'লে গুজব। কিন্তু তাঁর কানের পর্দা হয়ত' একটু রসালো ছিলো, দুপুর বেলায় নিঃঝুম বাড়ির এক নিরালা ঘরে সনাতনকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তিনি হুকুম করতেন কর্কশ ও কঠিন গলায় : গান গা!

গৃহ-কর্ত্রীর নধর ও দিনে-ঘুমানো চেহারার মধ্যে সব-চে স্পষ্ট ছিলো জল-জল চোখ দু'টি। সনাতন সেই দিকে তাকিয়ে সভয়ে ব'লতো, কি গাইবো?

কেন? নতুন গান শিখিস্নি বুঝি?

সনাতনের আত্মসম্মানজ্ঞান অসীম। এ-কথায় সম্মানে তার আঘাত লাগতো বিষম। সে ব'লতো, গান বুঝি আবার শিখ্তে হয়?

শিখ্তে হয় না?

না। সনাতন স্পষ্ট গলায় ব'লতো।

তবে যা ইচ্ছে গা। চিৎপাৎ হ'য়ে শুয়ে জড়তা-ভরা গলায় ব'লতেন সনাতনের মামার স্ত্রী।

সনাতন গাইতো। এক মনে সে সহজ ও সচ্ছন্দ গলায় পদের পর পদ এগিয়ে যেতো। এ পদাবলীর অর্থ হয়ত সে জান্তোনা আদৌ। তবু তার গলার স্বরে মনে হ'তো, সনাতন তার সমস্ত প্রাণটুকু ঢেলে দিয়ে অর্থকে আরো স্পষ্ট ক'রে তোলার চেষ্টা করছে। হঠাৎ কখন ত'র মামার সহধর্মিনী ঘুমে অচেতন হ'য়ে যেতেন, সনাতন টের পেত না। কিন্তু যখন তার খেয়াল হ'তো সে গুটিগুটি পায়ে বেরিয়ে যেতো ঘর থেকে।

সনাতন সোজা চ'লে আস্তো ইঞ্চির-ঘাটে, যে-ঘাটে বর্ষায় নদীর জল কতটা বেড়েছে তা মাপার মাপকাঠি আছে। সনাতন নিজের মনে এই অলস মধ্যাহ্নে এক এক ক'রে লোহার ফ্রেম-এ দাগ-কাটা ইঞ্চি গুণতো, আর নিজের মনেই অর্থহীন হিসেব করতো নানা রকম।

দিনের পর দিন চলেছে, হঠাৎ একদিন মামার টনক নড়ে ওঠে।

তাইত, সনাতনকে ইস্কুলে দিতে হয়, একেবারে মূর্খ ক'রে রাখা কোন কাজের কথা হবে না।

ইস্কুলের দিনগুলো তার কাছে বড্ড কঠোর আর কঠিন ঠেক্‌লো। চারদিকে কেবল প্রাচীরের বেড়া, তার বন্ধনহীন মন উধাও ঘুরে বেড়াবার পথে এ যে প্রকাণ্ড বিঘ্ন।

ইস্কুলের পাশের বিস্তৃত মাঠে কোনো-এক দুপুরে ঠকাঠক্‌ শব্দ ক'রে তাঁবু খাটানো হ'য়ে গেলো। এলো ভেড়া, ঘোড়া, বানর, বাঘ আর সঙ্গে এলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কটা চুলওয়ালা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মানুষ। কয়েকদিন পরে রাষ্ট্র হ'লো, শহরে সার্কাস্‌ দেখান হবে। সনাতন মনে মনে এদেরকে মহা ভাগ্যবান্‌ স্বীকার ক'রে নিজে অতিরিক্ত ব্যথা ও গ্লানি অনুভব ক'রলো। কেন, সে কি ইচ্ছে ক'রলে এদের একজন হ'তে পারে না? দেশে দেশে কেবল সে বেড়াবে ঘুরে, কোথাও থাকবে না কোনো স্থিতি। সমুখে ভেড়ার পাল ধূলো উড়িয়ে এগিয়ে চ'লবে, আর তার পিছনে ঘোড়ার পিঠে ব'সে সে-ও দল বেঁধে চ'লবে কোনো এক অনির্দিষ্ট পথে। হঠাৎ একদিন এক জায়গায় গিয়ে বাঁধবে একটি ডেরা। আ—চমৎকার! এই তো জীবন! সেখানে দেখাবে অদ্ভুত সব খেলা, লাগাবে দর্শকের চোখে তাক্‌। কিন্তু পরদিন সেখান থেকে হাওয়া। পরিচয় নেই, নাম জানেনা কেউ, নিজেকে নিয়েই নিজের পরিপূর্ণতা, নিজের পরিসমাপ্তি। সনাতনের এ-স্বপ্ন কবে সফল হবে।

ইস্কুল তার কাছে বিষময় হ'য়ে উঠলো। এখানে সে দেখলো শাস্তি আছে, শান্তি নেই। হাজার শাসন ও ভর্ৎসনা উপেক্ষা ক'রে সার্কাস্‌ পার্টির চারদিকে সে অজগর-আকর্ষিত ছোট একটি অসহায় পাখীর মত ছট্‌ফট্‌ ক'রে উড়ে বেড়াতে লাগলো।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। একদিন আবার শব্দ উঠ্‌লো ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে, শহরে খেলা দেখানো সাঙ্গ ক'রে তাঁবু ভেঙে সেই যাযাবর দল কোথায় চলে গেল।

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

সনাতন একা একা নদীর ধারে ব'সে গান গাইতে সুরু ক'রে দিলো। নৌকার মাঝিদাঁড়ির সঙ্গে ক'রলো ভাব, দেশ-বিদেশের নিলো সংবাদ, এবং মনের হাহাকার দিলো আরো বাড়িয়ে।

কিছুতেই কিছু হ'লোনা।

কিন্তু একদিন তার কানে পৌছলো একটি আহ্বান, পরদিন থেকে সনাতন হ'লো নিখোঁজ।

এদিকে তার খোঁজ-খবরে যখন লোকে হয়রান, সেই সময় বহুদূরের চিলমারি গ্রামের রথের মেলায় সনাতন তার গান শুনিয়ে লোকদের ক'রছে চমকিত। এই যাত্রাপার্টিতে সে যোগ দিয়েছে আজ প্রায় মাস তিন। অধিকারীর নজর তার ওপর পুরোদস্তুর। এক তিল তিনি একে চোখের আড়াল ক'রতে রাজি নন্। বলা যায় না, প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো নাট্যসমাজ একে ভুলিয়ে ভাগিয়ে নিয়ে গেলেই তাঁর পার্টি একেবারে কানা। অনেক দিনের সঞ্চিত সৌভাগ্য ব'লতে হবে তাঁর, তাই তিনি হঠাৎ এক ইঞ্চির-ঘাটে একে আবিষ্কার ক'রে বসেন। এবং একে নিয়ে চুপেচাপে হন রওনা। ছেলেটির গানের গলা অদ্ভুত, দূর থেকে গান শুনেই তিনি কিনারে ভিড়ালেন তাঁর নৌকা, এবং লাভ করলেন যে-ঐশ্বর্য তার তুলনা পাওয়া কঠিন।

সনাতনের এ জীবন মন্দ লাগ্‌লো না। এও তো বেশ, কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম মেনে চলার দীনতা নেই এখানেও। আজ চিলমারীতে সুভদ্রা-হরণ, কাল আবার ধুবড়িতে গিয়ে গাও লক্ষ্মণের-শক্তিশেল। মন্দ কি? সনাতন আজকাল হাস্‌ছে।

অনেক দিনই, প্রায় বছর চার, সনাতন এই দলে টিকে ছিল্‌ বটে কিন্তু বৃদ্ধ অধিকারী যখন নতুন নাটক নলদময়ন্তী খাড়া ক'রে জোর মহড়া দিচ্ছেন, এবং পুঠিয়া রাজবাড়ী থেকে তাদের নাৎনীর বিয়েতে গান গাইবার

জন্তে মোটা টাকার বায়না নিয়ে পরম আরামে কাৎ হ'য়ে ব'সে গড়গড়ার নল ফুঁক্‌ছেন, সেই সময় গৌহাটীর টিনের আটচালা থেকে সনাতন এক রাত্রে কোথায়-যে নিরুদ্দিষ্ট হ'য়ে গেলো তা কেউ জানে না।

তুমি হয়ত' এত কথা বিশ্বাস ক'রছো না, পঞ্চমি। ভাবছো, সবই আমার কল্পিত ঘটনা! হ'তে পারে কল্পিত, কিন্তু তার জন্তে দায়ী আমি নই, যদি দায়ী কেউ হন্ তাহ'লে আমাদের বৃদ্ধ বন্ধু নীলরতন বাঁড়ুয্যে। তিনি প্রাচীন লোক, অনেক তিনি জানেন, এবং তাই ব'লে বাজে-বকা অভ্যাস তাঁর নাই। আমার এ-ইতিহাস অবশ্য তাঁর কাছ থেকেই শোনা।

আরো অনেক দিন কেটে যাওয়ার পর আসামের এক চা-বাগানে নাকি সনাতনকে পাওয়া গেলো। তখনো সে ভীষণ ভাবে গান গায়, এবং সর্বদা কোলে ছোট্ট একটি মেয়েকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই মেয়েটিই অবশ্য আমাদের বর্তমান কালের কৌমুদী।

দুষ্ট লোকে অবশ্য বলে, কৌমুদী সনাতনেরই মেয়ে। কিন্তু, নীলরতনদা চাপা-গলায় বলেন, ব্যাপারটি নাকি তা নয়। চা বাগানের ডাক্তার আর বাগানেরই এক পাহাড়ী মেয়েতে নাকি ঘটেছিলো সাময়িক প্রণয়, কৌমুদীই তার পরিণতি। কৌমুদীর জন্মের পর পাহাড়ের গুহায় গুহায় সুরু হ'লো বিষম দ্বন্দ্ব। কোনো এক পাহাড়ী ছেলেতে আর সেই পাহাড়ী মেয়েতে একদিন বাধলো সংগ্রাম; কারণ, ছেলেটির একটু গোপন আসক্তি ছিল এর প্রতি; ডাক্তারের পিছন পিছন ঘুরতো সেই ছেলেটি ভীষণ আক্রোশ নিয়ে আর পাহাড়ী মেয়ে ডাক্তারকে সর্বদা সাবধান হ'তে বল্‌তো। তারপর সেই পাহাড়ের খাদে পাহাড়ী ছেলেটির মৃতদেহ পাওয়া গেলো নাকি এক সন্ধ্যায়, এবং কৌমুদীর মা হ'লো নিরুদ্দেশ। এর থেকেই নাকি প্রমাণিত-যে কৌমুদীর মা-ই হত্যা ক'রেছে তার প্রণয়ীকে। অসহায় সেই শিশুটি এখন যায় কোথায়? আমাদের সুযোগ্য সনাতন তখন এগিয়ে এসে তাকে

কোলে তুলে নিল নাকি। অবশ্য এত রহস্য বেশী লোকে জানে না, ওস্তাদ সনাতনের নানারূপ কেরামতিতে সব ঢাকা-চাপা আছে।

কৌমুদী-যে সনাতনেরই মেয়ে, এই কথা রাষ্ট্র হওয়ায় সনাতন যেন মনে মনে বেশ গর্ব অনুভব করে।

হ'তে পারে কপোল-কল্পনা, তবু তোমাকে বিশ্বাস ক'রতেই হবে, পঞ্চমি! কারণ, অবিশ্বাসীর দুঃখ অনেক। সোজাসুজি যদি বিশ্বাস ক'রে নাও তাহ'লে মনের মধ্যে অযথা কোনো আন্দোলন সুরু হবে না, অযথা বেদনার কষ্ট থাকবে না, পৃথিবীর প্রবীণেরা সেই জন্যেই হয়ত' নাস্তিক নন্।

আশ্চর্য মনের জোর ব'লতে হবে সনাতনের। নিজে তো সে বাউণ্ডুলে, তবে কোন্ সাহসে কিসেরই-বা ভরসায় এত ভয়ানক একটা দায়িত্ব সে মাথা পেতে গ্রহণ ক'রলো! কিন্তু আরো আশ্চর্য বলতে হবে, কৌমুদীকে গ্রহণ করার পর থেকেও সনাতনের জীবনের দুর্বার গতি থামলোনা। এখনও সে সর্বদা মনে মনে প্রার্থনা করে একটা ভ্রাম্যমান জীবন। অথচ সার্কাস-ওয়ালাদের জীবনের চলন্ত গতি দেখে মনে মনে সে করে করুণা। কেবল কোনো যাত্রাপার্টির গান শুনলে তার মনে পড়ে সেই বৃদ্ধ অধিকারীকে, তাঁর স্নেহকে, তাঁর মমতাকে! সনাতনের চোখে জল আসে। ফ্রক-পরা কৌমুদীকে পাশে বসিয়ে সে দেখে কৃষ্ণ-লীলা, আর নিজে নিজেই গুণ গুণ ক'রে গান গায়। পার্শ্বস্থ দর্শক এই অকারণ গুঞ্জনে বিরক্তিকর দৃষ্টিপাত ক'রে সনাতনের দিকে পিছন ফিরে ঘুরে বসেন। সনাতনের কিন্তু এ-উপেক্ষায় এতটুকু দৃষ্টি নেই!

বুকের ওপর কৌমুদীকে সামান্য তৃণরূপে গ্রহণ ক'রে স্রোতের শ্যাওলার মতো সে ঘাটে ঘাটে ভেসে বেড়ায়। এমন লোকের কাছে উপেক্ষার আবার দাম আছে নাকি?

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

এই তো গেলো সনাতনের জীবনের বিচিত্র ইতিহাস। এবার আমাকে মূল আখ্যায়িকায় ফিরে আসতে হবে।

হাসপাতালের চিকিৎসা শেষ হ'য়ে গেছে। কৌমুদী এখন একেবারেই একা, তার পরিচারিকা গোলাপদি অবশ্য তার পিছনে ছায়ার মতো ঘোরে। সারারাত শিয়রে ব'সে এই গোলাপদিই-না কৌমুদীকে নানা রকম সান্ত্বনার কথা ব'লছে! রাজবাড়ীর ঘড়িতে রাত বেজে যায় দু'টো, গোলাপদি বলে, কুমু, ঘুমুলি?

উত্তরে কৌমুদী বলে, আমার কী হবে, গোলাপদি? আমার যে আর কেউ নেই!

গোলাপদি একটু থেমে বলে, তোর বিজনদা। তার চিঠি তো আজের ডাকেও এলো না! ছাখ, হয়ত কাল এসে পড়তে পারে।

তার চিঠিতে আমার লাভ?

গোলাপদি নিজের ভুল সংশোধন ক'রে বলে, না না! চিঠি কেন, সে নিজেই আস্‌বে!

এ-কথায় কৌমুদী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে গভীর, কোনো প্রতিবাদ কিংবা কোনো প্রত্যুত্তর করে না!

অনেক দিন পরে, আজের এই একান্ত অসহায় অবস্থার মধ্যে কৌমুদীর মনে পড়ে বিজনের কথা অহোরহ। তন্দ্রা-জড়িত চোখে তার ভেসে আসে একটা অপরূপ ছবি। সে দেখে, তার বিজনদা আস্‌চে। ক্লান্ত দুটি পা টেনে টেনে বহুদূর পথ হেঁটে বিজন আস্‌চে। মুখে তার সহানুভূতির সহজ প্রতিচ্ছবি, চোখে তার সরল মমতা, কপালে তার কৌমুদীর-প্রতি-স্নেহের সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব। আজ কতদিন বাদে কৌমুদী ভাবছে বিজনকে! বিজন যেন সদর-হাসপাতালের পিছনের শুর্কি-ঢালা রাস্তা দিয়ে জুতোর সর-সর শব্দ ক'রতে ক'রতে ক্রমশই এগিয়ে আস্‌চে। তাদের বাড়ীর সাম্নের মাঠের সেই

তেরছা পায়ে-হাঁটা পথে সে এবার শব্দহীন পদবিক্ষেপে প্রাচীরের গায়ে এসে প'ড়লো! ওই তো, সত্যিই তো! কৌমুদী স্পষ্ট শুনতে পেলো দরজার কব্জায় মৃদু আর্তনাদ, তার পরেই এই তো ইট-বসানো পথে জুতোর ঠক-ঠক শব্দ, ঘরের কাঠের তক্তায় তার মড়মড় শব্দে পদপাত! বিজন তার শিয়রে ব'সে কৌমুদীর মাথায় হাত বুলাচ্ছে। পরম আরামে, একান্ত নিশ্চিন্তে সে এই আদর উপভোগ ক'রছে নিরিবিলি! নিজের হাতটি দিয়ে সে সেই প্রণয়ীহাত চেপে ধ'রে অস্ফুটে ডাকলো, বিজনদা!

গোলাপদি কৌমুদীর মুখের ওপর উপুড় হ'য়ে ব'ললো, আসবে। ভাবিস্‌নি!

কৌমুদী চম্‌কে উঠ্‌লো। ম্লান আলোয় গোলাপদির মুখের দিকে তাকিয়ে সে নিশ্বাস ফেল্‌লো গভীর ভাবে।

কৌমুদীর ঘুম গেলো কেটে। এই আলোয়-অন্ধকারে রচা ঘরের মধ্যে সে বিজনের প্রতিমূর্তি দেখতে পেলো স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। বিজন তার দিকে তাকিয়ে হাস্‌ছে নাকি? তার এই গভীর দুঃখের দিনেও বিজনের মুখে হাসি তাহ'লে ফুটছে? সত্যি, কৌমুদীর বুকের ভেতরটা কেমন যেন জ্বালা করে।

যাক্‌ গে! কৌমুদী পাশ ফিরে শুলো। আজ, এই মুহূর্তে, কৌমুদী নতুন ক'রে বুঝতে পারল সনাতন নেই। সত্যি ক'রে দেখ্‌তে গেলে পৃথিবীতে আপ্‌নার ব'লে দেখ্‌তে তার আর আছে কে?—বিজন? সে তো অনেক দূরে! সনাতনই ছিলো তার জীবনে জড়িত; এখন সে নেই। হাজার চেষ্টায়ো এখন তাকে ফিরিয়ে আনা কৌমুদীর সাধ্য নয়। কোথায় গেলো সনাতন, আর কোথায়ই-বা রইলো কৌমুদী! মানুষের দুঃখের দিনে পরম-আত্মীয় বুঝি এম্‌নি ক'রেই দূরে স'রে দাঁড়ায়।

বিজন এখন একবার এলে পারে। নিজেকে কৌমুদীর ভীষণ অসহায় ব'লে ঠেকছে। একটি অবলম্বন একান্ত প্রয়োজন তার। চিঠি নিশ্চয় সে

পেয়েছে, এ-চিঠি পথে মারা যাবার নয়। চিঠিতে কৌমুদী-তো কোনো সুখের সংবাদ দেয় নি অমন! আজ পাঁচ দিন হ'য়ে গেলো সনাতনের মৃত্যুর পর। আর, চার দিন হ'লো গেছে তার চিঠি। যাই হোক্, সে মাঝে মাঝে মুষড়ে পড়লেও গোলাপদি তাকে আশ্বাস দিয়ে সোজা রাখ্ছে, এমন দুর্দিনে এমন একজন সমব্যথীই-বা জোটে ক'জনের ভাগ্যে! কৌমুদীর শোকের মুখে এ-ও কম সান্ত্বনা নয়!

কৌমুদী আড় চোখে তাকিয়ে দেখলো, গোলাপদি রীতিমতো ঢুল্ছে। সহসা তার নিজেকে আরো-যেন অসহায় মনে হ'লো! এই দ্বিপ্রহর রাত্রে অগণিত প্রেতাত্মার দন্তহীন বিভীষিকা তাকে যেন জড়িয়ে ধরলো আষ্টেপৃষ্ঠে। একটা ভয়ের হিম তার শরীরের অস্থিতে জাগিয়ে দিলো ঠাণ্ডা স্রোত। কৌমুদী ঝিমন্ত-গোলাপদির হাত চেপে ধরলো।

গোলাপদি চম্‌কে উঠেই হাতের পাখা নাড়তে নাড়তে ব'ললো, উঃ, কি অসহ্য গরম, ঘুমও কি আসে চোখে? কুমু, ঘুমুলি?

কৌমুদী কোনো সাড়া দিলো না।

সনাতনের গলার একটা গান তার কানে ঝঙ্কার দিচ্ছে। তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে আরো যে-একজন গানটি গাইছে সে তো অবশ্যই বিজন! কৌমুদীর বুকের স্বচ্ছ ও শান্ত জলাশয়ে পাশাপাশি ছায়া পড়লো দু'জনের: বিজন আর সনাতন। সেই গৌহাটীর ঘটনা। যখন বিজন রোজ কলেজ-ফেরতা আস্তো সনাতনের কাছে। সনাতন ছিলো বিজনের ওস্তাদ। গীর্জার ঘড়ির শব্দের মতো তানপুরাতে গম্ভীর সুর বাজিয়ে বিজন কত সহজে সনাতনের সুরে মেলাতো নিজের গলা। কৌমুদী অনেক দিন অনেক অজুহাতে নিজের উপস্থিতি দিয়ে সেই পরিবেশটিকে নিজের কাছে আর বিজনের কাছে করেছিলো কত মধুময়। কটন্ কলেজের সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় যেদিন বিজন প্রথম হ'লো, উঃ,

সনাতনের সেদিন কী বিষম পাগলামী। আদর ক'রে বিজনের পিঠে চাপড় দিতে দিতে বিজনকে প্রায় শেষ ক'রে ফেলেছিলো আর কি। তখন ভাগ্যিস্ কৌমুদী কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে সনাতনকে ধমক দিয়ে ক্ষান্ত করেছিলো। আর ভাগ্যিস্ সেই আদরের চোট্ বিজনকে ডিঙিয়ে প'ড়েছিলো এই কৌমুদীর ওপর। এবং এই দিনের ঘটনা দিয়েই তো কৌমুদীর জীবন হ'য়ে উঠলো তৈরি! সনাতনের পাগলামীর সুযোগে দুদিকের দু'টো স্রোত এক জায়গায় মিলিত হয়ে ভীষণ আবর্তের সৃষ্টি ক'রে তুললো! সে-কথা সনাতন হয়ত টের পায়নি! তার পরও কিছুদিন সেখানেই ছিলো তারা, কিন্তু দারুণ দুঃসংবাদের মতো সনাতন একদিন এসে ব'ললো—চল্ কুমু, গৌহাটী পুরানো হ'য়ে গেছে, কিছুদিন চাটগাঁ ঘুরে আসি।

সনাতনের খেয়ালই এম্‌নি। এতে কৌমুদী চম্‌কায়না, তার এ-সব সহ্য হ'য়ে গেছে। জীবনের প্রথম দিন থেকেই তো সনাতনের সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুরছে এখান থেকে সেখানে। তার জীবনেও যেন কোনো খানে স্থায়ী স্থিতি সহ্য হয় না। কিন্তু গৌহাটীকে কৌমুদী ভয়ানক আপনার বলে গ্রহণ করেছিলো ব'লেই এ-জায়গা ছাড়তে তার রীতিমতো কষ্ট হ'য়েছিলো। গেলো তারা চাটগাঁ—সেখানকার জল বাতাস হ'লোনা সহ্য, চলে এলো নোয়াখালি, থাক্‌লো কিছুদিন; তারপর ঘুরতে ঘুরতে এলো এখানে। এখানেই সনাতন হ'লো শেষ, তার জীবনের শ্মশান আগে থেকেই হয়ত ছিলো নির্বাচিত!

কথাটি মনে হ'তেই কৌমুদীর বুকের স্বচ্ছ ও শান্ত জলাশয়ে প্রচণ্ড একটি আন্দোলন উপস্থিত হ'লো, ছোটো ছোটো অফুরন্ত ঢেউ-এর আঘাতে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙে গেলো বিজন, চূর্ণ হ'লো সনাতন। কৌমুদীর এই অলস রাত্রির অবসর তার কাছে বোধ হ'লো

বিষাক্ত বিস্বাদ। এ-ক্ষেত্রে কৌমুদীর কি করা উচিত, কি সে করেছিলো অত খুঁটিনাটি ঘটনা রচনা আমি করতে পারবোনা, পঞ্চমি! জানো তো আমাকে তুমি, চেনোও আমাকে; আমার সাহিত্য সহ্য না করলেও আমার রচনার তুমি বড় ভক্ত। নাহ'লে তুমি দূরেও থাকতেনা, আর লম্বা একটি চিঠি লিখে তোমার কাছে পাঠানোর জন্যে বায়নাও ধরতেনা। এ আমার এক পরম ঈশ্বর-আশীর্বাদ ব'লতে হ'বে। ধরো, যদি তুমি উল্টোটি করতে: সঙ্গে সঙ্গে থেকে তুমি যদি নাক সিঁটকাতে আমার লেখা দেখে। উপুড় হয়ে শুয়ে যখন বেশ জমাট একটা কবিতা ফেঁদে বসেছি, তখন যদি তুমি শত অনুনয়ে পরাস্ত হয়ে অবশেষে মরিয়া-সাহসে (আমার দুটি কাঁধ দু'হাতে টেনে ধরতে, আর বলতে: 'আর লিখোনা, লিখে কি হবে?' তার চেয়ে এই ব্যবধানে থেকে সে সমস্যার যে সমাধান করেছ তাই কি শুভ হয়নি? নিশ্চয়ই হয়েছে। নইলে তুমি আমার হাজারো ডাক উপেক্ষা করে তোমার টাঙাইল আঁকড়ে উপুড় হ'য়ে পড়ে থাক্‌তেনা।

কিন্তু বিজন কেন গৌহাটী আঁকড়ে কৌমুদীর এই দুঃসময়ে তাকে দূরে রেখে অযথা এই ব্যবধান সৃষ্টি করে সুখী হ'য়েছে, সে আবার আরেক নতুন সমস্যা। এ-সমস্যা তোমার আমার নয়, কৌমুদীর। সে বেচারী এক সনাতন-বিয়োগে অস্থির, তার ওপর বিজনের নেই কোনো সংবাদ। নেই সেই দুঃসংবাদবাহী চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার! সারারাত কৌমুদীর চোখে ঘুম এলোনা, গোলাপদি কিন্তু তার অসহ্য গরমের কথা ভুলে গিয়ে নাক ডাকাতে সুরু করেছে।

ভোরের কিছু আগে কখন-যেন কী ক'রে কৌমুদী ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু একটু বেলায় ঘুম ভাঙলে মানুষের-যে এত অসহ্য চমক লাগে এ-সংবাদ তো এর আগে সে জান্‌তো না! মেঝেয় কাঠের পাটাতনে

বিছানা বিছিয়ে সে আছে ঘুমিয়ে, গা মোড়ামুড়ি দিয়ে একটু তাকাতেই সে দেখলো, বাতার বেড়ার ফাঁক দিয়ে খানিকটা হল্‌দে রোদ্দুর ঘরে এসে ছড়িয়ে পড়েছে, আর একটু ভাল ক'রে তাকাতেই—সে কি? কৌমুদীর বুকটা ছ্যাং ক'রে উঠলো। নাঃ, বিশ্বাস করা তো মুস্কিল! কৌমুদী ধড়ফড় করে উঠে ব'সলো, ত্রস্ত হাতে এলোমেলো গায়ের কাপড় গোছ-গাছ করতে করতে চকিত চোখে তাকাতেই বিজন ব'ললো, অনেকক্ষণ এসেছি, ঘুমোচ্ছিলে তাই ডাকিনি। কি বলে গিয়ে, তোমার কাছে কে না থাকে, কি নাম যেন, টগর না কি! সে কই?

কেন, গোলাপদি নেই?

কোথায়? দরজা খোলা, হ্যাঁ সদরও। আমি সরাসরি চলে এলাম। না, বাড়ি চিন্‌তে আবার বেগ! এ-জায়গায় তো বহুবার এসেছি, সবি প্রায় চেনা—

কৌমুদী বিজনের কথায় ঠিকমত কান দিতে পারলোনা, গোলাপদি তবে গেলো কোথায়? সারা রাত সে কি তবে একলা কাটালো? কৌমুদী বিজনের কথায় হুঁ দিতে দিতে ব'ললো, কিন্তু গোলাপদি—

সদরের দরজায় শব্দ হ'তেই কৌমুদী লাফিয়ে উঠে জানলা দিয়ে তাকাতেই—এই তো! গোলাপদি ভিজে কাপড়ের আঁচল নিঙড়াতে নিঙড়াতে অলস পায়ে ইটবসানো রাস্তার ওপর এসে পড়েছে।

কৌমুদী বললো, গিয়েছিলে কোথায়, গোলাপদি?

নেয়ে এলুম। সারা রাত কি অসহ্য গরম, দুই চোখের পাতা এক করে কার সাধ্য। তুই ঘামিস্‌, আর আমি হাওয়া করে রাত কাটাই!

বিজন কৌমুদীকে বললো, কথা শুনে মনে হচ্ছে লোকটা ভালো—

খুউব।

কথাটার মধ্যে শ্লেষ আছে কি না, কৌমুদীর গলার স্বরে বোঝা গেলোনা।

গোলাপদি কান খাড়া করে বললো, ঘরে কে কথা বলে?

কৌমুদী এর কোনো উত্তর দিলো না। কেবল বিজনের মুখের দিকে তাকালো। বিজনও তাকালো কৌমুদীর দিকে।

দ্রুত পায়ে গোলাপদি দরজার কাছে এসে উঁকি দিলো। কে এ? এ-কে তো গোলাপদি চেনেনা! প্রকাণ্ড ছুটো বিস্ময় গোলাপদির দুই চোখে প্রচণ্ড হয়ে ফুটে উঠলো। বিজন সেদিকে তাকাতে সঙ্কোচ বোধ করলো, কৌমুদীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল বিজন। কে এ? একে তো গোলাপদি চেনেনা! একটা বেডিং, একটা সুটকেশ! ওঃ, এইবার সে চিনেছে। বললো, কে তুমি?—বিজন?

বিজন চম্‌কে উঠলো। সে কি, এ তাকে চিন্‌লো কি করে? কৌমুদীর দিকে তাকাতে কৌমুদী ম্লান হাসলো।

গোলাপদি পরম অন্তরঙ্গ গলায় বললো, বসো বাবা বিজন, বসো! আমি চট্ করে কাপড়টা ছেড়ে নি! দে কুমু, লক্ষ্মীটি! কাপড়টা ছুঁড়ে দে!

কৌমুদী কাপড় দিতেই গোলাপদি অন্তর্ধান করলো। বিজন বললো, আমাকে চিন্‌লো—

পরম উদাসীন সুরে কৌমুদী বললো, নাম শুনেছে।

ওঃ!

আমি জান্‌তেম তুমি আসবে। ব'লতে ব'লতে গোলাপদি ঘরের মধ্যে চ'লে এলো: কম বুঝিয়েছি কুমুকে? বেচারী ভেবে সারা! বলে, বিজনদা ভুলে গেছে! আমি সে কতো বোঝাই! বলি, ভোলেনি, ভোলেনি।

কৌমুদী মনে মনে গোলাপদির ওপর জ্বলছে, বললো, বাজে কথা রেখে হাত মুখ ধোয়ার জল আনো, গোলাপদি!

আন্‌ছি! সারা রাত রেলগাড়ির ধকল, মুখে কালী প'ড়েছে! কুমুর এবার মনে একটু শান্তি হ'লো। আহা, কচি মেয়ে! সারাদিন বলে,

আপ্‌নার ব'লতে ওর নাকি আর কেউ নেই। আমি বলি—কেন তোর বিজনদা আছে! তবে একটু থামে।

তুমি যাও গোলাপদি, দেরী ক'রোনা! কৌমুদী গোলাপদিকে যেন ঠেলে দিলো।

বিজন বললো, যাবে অখন, তাড়াতাড়ি কি?

না বিজনদা, ও বড্ড সব কাজে দেরী করে।

গোলাপদি ব'ললো, তাহ্‌লে আগেই দি, বাপু, জল!

হাত মুখ ধোয়ার পর পালা এলো দুঃখের। বিজন মুখ ম্লান ক'রে মাথা নিচু ক'রে বস্‌লো চুপচাপ। তার কিছু দূরে ব'সে রইলো কৌমুদী কথাহীন! গোলাপদি দরজার চৌকাঠে কোমর ঠেসান দিয়ে ব'সে নিশ্বাস ফেলে ব'ললো, আহা!

কৌমুদীর চোখ দিয়ে জল পড়লো কাঠের পাটাতনের ওপর। বিজন কিছুক্ষণ তা লক্ষ্য করে ব'ললো, ছিঃ, কাঁদতে নেই! কেঁদে তো লাভ নেই কোনো!

আর লাভ! গোলাপদি নিশ্বাস ফেললো: থাকার মধ্যে ছিলো এক বাপ। মা-হারা মেয়ের সব অভাব ঢেকে রেখে মানুষ ক'রে তুললো—

বিজন বাধা দিয়ে ব'ললো, থাক্‌ সে কথা।

গোলাপদি ব'ললো, থাক্‌বে বই-কি। এ-কথা কি আর বলার। কী মানুষই ছিলেন! তাঁর গান যে শুনেছে সে কি তাঁকে ভুলবে? এই তো রাজবাড়ীতে দোলের জলসায় গলার ঘা নিয়েও যা গাইলেন-যে কুমার তক্ষুনি উঠে এসে কানে কানে কি-যেন ব'লে গেলো, অমনি তিনি তার সঙ্গে চ'লে গেলেন রাজবাড়ীর ভেতরে। শুনেছি তো সব, রাজবাড়ীতে চাকরি দিতে চেয়েছিলো, নিলেন না। জীবনে কারো গোলামী করেননি, হুঁ। মনটা ছিলো কী উঁচু। এমন মানুষের কি না

ধরলো এই কাল রোগে!

কৌমুদী এবার ফুঁপিয়ে উঠ্‌লো।

বিজন ব'ললো, থাক্ গোলাপাদি! সে কথা তুলে আর লাভ কি?

গোলাপদি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলো: আর লাভ!—যাই এবার, তোমার জন্যে একটু খাবার জোগাড় দেখি! বেশ ছেলে, লক্ষ্মী ছেলে, ব'সো!

একা ঘরে বিজন আর কৌমুদী। দু'জনেই দারুণ নির্বাক। বাইরে গোলাপদি কাজে ব্যস্ত হয়ে প'ড়েছে। এর আগে এ-বাড়ির বর্ণনা দেওয়ার সময় আমি তোমাকে সুধুমাত্র দু'খানি ঘরের ছবি দেখিয়েছি। কিন্তু এ-বাড়িতে আরো-যে ঘর আছে, সে-কথা আমার বলা দরকার। মাঝখানে মস্ত একটা উঠোন, বড় বড় ঘাস আর আজে-বাজে গন্ধহীন ফুলের ঝোপে উঠোন একেবারে নিশ্চিহ্ন; উঠোনের তিন দিকে তিনখানি চৌচালা, একদিকে পাতকুয়ো। কৌমুদী যে-ঘরটায় থাকে তার কোমরে এখনো জোর আছে সামান্য। বাকি দু'টোর ভিৎ পড়েছে কাৎ হয়ে, টিন পড়েছে ঝুলে। আমাদের গোলাপদি এখন সেই ভাঙা ঘরের ভেতর গেছেন, সেখান থেকে সংগ্রহ করছেন তিনি কাঠ, আর ঐ দিকের বারান্দায় কাঠের জ্বালেই তিনি তৈরী করবেন চা। আজকাল কৌমুদীর শোবার ঘরের পাশের ঘরটি আর রন্ধনশালা নয়।

কুয়োর পাশের ন্যাড়া নারকেল গাছে এখন কাঠ-ঠোকরা বেসুরো ঠক্‌ঠক্ করছে। এই নারিকেল গাছটিকে আমি বলি একটি মিনিয়েচার মনুমেণ্ট, আর উঠোনটি গড়ের-মাঠ, শানবাঁধানো কুয়োর সীমাটা যেন কলকাতার কেল্লা! চমৎকার পরিবেশটি। একটা পড়ো বাড়ি হলেও এর ভেতর চমৎকার কাব্য আছে। ঐ যে কাঠ-ঠোকরা তার রঙ-চঙে পাখার গর্বে টইটুম্বর, বারে বারে গাছের ঠিক ডগার দিকের ফুটোর ভেতর

থেকে নিজের মাথাটি বের ক'রে চারদিকে তাকাচ্ছে, সেখানেও প'ড়ে আছে একটি কবিতা। কিন্তু এখন সে-কবিতা নিয়ে কাব্য করার সময় কই? বিজন আর কৌমুদীকে অনেকক্ষণ একা রেখেছি, তাদের চোখের জল শুকাবার সুযোগ দিয়েছি অনেক, এবার এসো, পঞ্চমি! তুমি তোমার টাঙাইলের উচ্চসিংহাসন থেকে নেমে এসো আমার কাছে এই করদরাজ্যের শহরতলীতে—এই কুচবিহারে। যেখানে বিজন আর অধুনালুপ্ত কৌমুদী পাশাপাশি আছে ব'সে। ভাবতে বড় খারাপ লাগছে, পঞ্চমি, এমন পরিপাটি এমন সুন্দর এমন শান্ত এমন লক্ষ্মী একটি মেয়ে কিনা মারা গেল অপঘাতে!

ওই শোনো গোলাপদির কথার ঝাঁজ। কাঠঠোকরা অত দূরে আর অত উঁচুতে ব'সে ঠোঁট বাজাচ্ছে, তাতে এর কী বা এলো গেলো, গোলাপদির বাড়া ভাতে সে তো মুখ দিতে আসেনি!

কাঠের চ্যালা হাঁটু দিয়ে ভাঙতে ভাঙতে গোলাপদি খিঁচিয়ে উঠলো: আরে, ম'লো যাঃ। সুধু ঠক্‌ঠক্, সুধু ঠক্‌ঠক্।

পুলিশের ফাঁড়ির ঘড়িতে বেজে উঠলো আটটা। তারি একটু পরে, কানকে বিশ্রাম দেওয়ার আগেই রাজবাড়ির ঘড়িও আটটা ঘণ্টা বাজিয়ে দিলো।

বিজন হাতের ঘড়ি দেখে নিজের কানে দিয়ে ব'ললো, চলছে তো। তবে স্লো হলো আবার কেমন করে?

কৌমুদী বললো, কয়েকদিন থাকবে তো বিজনদা? পরীক্ষা তো হয়ে গেছে, থাকো কয়েকদিন।

উপায় নেই, কৌমুদী। বিজন বিপন্ন মুখে ব'ললো: তুমি আমাকে হয়ত ভুল ভাবছো, কিন্তু তুমি চেনো তো আমার বাসার লোকদের। এখানে-যে এসেছি, তা কেউ জানেনা। আমি মিথ্যে কথা বলে এসেছি। কি ব'লেছি জানো?—আমার বন্ধুর বিয়ে লালমনিরহাটে।

কৌমুদী চুপ ক'রে রইলো।

থাকায় কি আমার অনিচ্ছে? বিজন ধীরে ধীরে বললো: তুমি কী ভীষণ বিপদে পড়েছ তা কি আমি বুঝি না? তবু যেতে হবে!

আজই!

না, আজই নয়। কাল। বিয়ে তো আর একদিনে হয়ে যায় না। বিজন ম্লান হাস্‌লো।

কৌমুদী বিজনের মুখের দিকে একটু তাকিয়েই মাথা নামালো: যাও।

না গিয়ে আর উপায় কী বিজনের! তার মনে যদিও একান্ত ইচ্ছা সে অসহায় কৌমুদীর সম্বল হয়, কিন্তু অভিভাবকের অভাবনীয় শাসনে সে গুনে-গেঁথে ফেলে পা, ভেবে চিন্তে বলে কথা, গ্রাস গুনে খায় ভাত! এমন কথা তাই ব'লে আমি বলছিনা-যে তার অভিভাবক বিজনকে লাঞ্ছনা করেন। বিজনের বাবা তো আর সনাতনের প'ড়ে-পাওয়া মামা নন্। তেমন হ'লে আজ হয়ত বিজনকে আমাদের এ-আখ্যায়িকায় স্থান দেওয়ার মতো সুযোগই পেতাম না। সনাতনের মতো মনের জোর থাকে ক'জনের। তেমন হ'লে বিজন কোন্ কালে হয়ত একটা বন্দুকের গুলিতেই নিজের মাথা ফুটো ক'রে দিতো। তাহ'লে আমি, এই পত্রোপন্যাস-লেখক সুশীল রায় নয়— এই পত্র-লেখক শ্রীযুক্ত সুশীল সেনগুপ্ত, আজ পাঁচ বছর আগে দেবতার আশীর্বাদরূপে-হঠাৎ-পাওয়া রাঁচী থেকে বাড়িমুখো চির কামনার বিধবা কামিনী (চ'টোনা!) শ্রীমতী পঞ্চমী দেবীকে এমন ইনিয়ে বিনিয়ে টিপেটিপে এমন একটা লম্বা চিঠির মধ্যে শ্রীমান্ বিজনকুমারের সংবাদ কি দিতে পারতেম? লেখকদের ওপর ভগবানের অযাচিত আশীর্বাদ আছে, কেমন সুন্দর ক'রে তিনি সাজিয়ে দেন ঘটনাগুলো, কেমন পরিপাটি ক'রে তৈরী ক'রে রাখেন বলার কথা! আমার সে ভগবান বস্তুটি কে, তা আমি ঠিক জানিনে। তিনি কি নারী-বেশে মর্ত্যের কোনো সুদূর পল্লীগ্রামে

পাড়ার মেয়েদের সেলাই শিখিয়ে দু'পয়সা রোজগার ক'রে গ্রাসাচ্ছাদন চালাচ্ছেন, আর বহুদূরের শহরবাসী এক নগণ্য নাগরিকের ওপর পত্রযোগে চালাচ্ছেন তোমৃবি ?—এবার নিশ্চয় তুমি চ'টেছো, তোমার গালের পাৎলা চামড়া ছিঁড়ে রক্ত ছিট্‌কে বেরিয়ে আসবে, যদি তোমাকে আর এক ডিগ্রি বেশি রাগাই ! অতএব এসো, আমাদের দু'জনের কথা আপাততো তুলে রেখে তৃতীয় ব্যক্তিকে নিয়ে বক্তৃতা দেওয়া যাক্ !

কৌমুদীর চোখের লোনাজল তার গালের ওপর আঠার মতো শুকিয়ে উঠেছে। উঠে গিয়ে বারান্দার বালতি থেকে চোখ মুখ ধুয়ে এলো।

বিজন ব'ললো, এখন তুমি কি করবে ?

আমার কথা দিয়ে দরকার নেই ! কৌমুদী বেসুরো-গলায় ব'ললো, তুমি এখন কি করবে তাই আমাকে ব'লে যাও, বিজনদা !

আমি ? বিজন অতি সহজস্বরে প্রত্যুত্তর দিলো : বি. এস্‌সি. যদি ভগবান-ইচ্ছায় পাশ করতে পারি তা'হলে হয়ত' রুড়কি কিংবা শিবপুর—

কৌমুদী বিস্ময়ে পাথর হ'য়ে মূঢ়ের মতো তাকালো তার দিকে : তার মানে ?

বিজন মাথা নিচু ক'রেই ব'ললো : বি. ঈ. পড়তে হবে।—বাবার ইচ্ছে, আমি ইঞ্জিনিয়ার হই ; কিন্তু আমার ইচ্ছে, ডাক্তারী পড়ি। তোমার কী মত, কৌমুদী ?

কৌমুদী নিরুত্তর।

বিজন আবার পুনরুক্তি করলো : ব'ললেনা, তোমার কী মত ?

আমার মত ? কৌমুদী সশব্দে নিশ্বাসপাত ক'রে হঠাৎ অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলো, এবং নিজেকে গোপন করার জন্যে উঁচু গলায় ডেকে উঠ্‌লো : গোলাপদি, এখনো সামান্য একটু চা করতে পারলেনা ?

ভিজে কাঠে ধোঁয়া হ'চ্ছে, আগুন হ'চ্ছেনা। গোলাপদি জ্বালাতনে অস্থির হ'য়ে দাঁতে দাঁত রেখে ব'ললো: যাই, একটু সবুর কর, লক্ষ্মীটি।

শিগ্‌গির এসো। কৌমুদী আবার বিজনের দিকে মনোযোগ দিলো।

কি ভাবতে ভাবতে কৌমুদী চোখের কোনায় আঁচল তুলে নিলো। বিজন বললো, ছিঃ, অমঙ্গল হবে।

ভিজে গলায় কৌমুদী বললো, কার?

তাঁর আত্মার। বিজনের গলার স্বরেও একটু বাষ্পের আভাষ বোধ হ'লো যেন!

কৌমুদী এ-কথার কোনো উত্তর দিলোনা। আর কিছু তার মনে হ'চ্ছেনা, কেবলই মনে হ'চ্ছে, এ অসম্ভব। সনাতন-যে এমন নিষ্ঠুরের মতো তাকে এমন একা ফেলে চলে যেতে পারে, এ কিছুতেই সত্যি হতে পারে না। কৌমুদীর মন এত নরম-যে তার তুলনা হয় না। কে বলবে, এ সেই মায়ের মেয়ে, যে তার-প্রতি-আসক্ত-একটি-ছেলেকে নির্মম হাতে খুন ক'রেছে তার ভাক্তারের জন্যে। মনে হয়, কৌমুদী যেন আন্‌কোরা বাঙ্গালী গর্ভজাত। সত্যি পঞ্চমি, এই সব ক্ষেত্রে কৌমুদীকে পেলে নীলরতনবাবুর কথাগুলো রীতিমতো ঘটনা ব'লে মনে হয় না, মনে হয় রটনা। কিন্তু গুজবই যদি হবে তাহলে কৌমুদীর মুখের ছাঁদে পাহাড়িনীর গড়ন থাকৃতো কিংবা গায়ের রঙ কি অমন লালচে-শাদা হ'তো?

গোলাপদি অনেক কষ্টে চা নিয়ে এলো। সঙ্গে আবার খানিকটা সুজিও।

গোলাপদির গায়ে যেন কোথা থেকে জোর এসে গেছে, ঠাস্ ক'রে সে ব'সে পড়লো মেঝের ওপর, কাঠের তক্তা তার দেহের ভারে সশব্দে মড়মড় শব্দ ক'রে উঠ্‌লো।

গোলাপদি দীর্ঘ নিশ্বাসের শেষে ব'ললো, যাক্, এবার আমার ছুটি। যার ধন তার হাতে সঁপে দিয়ে আমি এখন যেতে পারলেই বাঁচি।

বিজন আর কৌমুদী এ ওর মুখের দিকে তাকালো। এ-কথার কোনো মানেই তারা যেন খুঁজে পেলোনা।

গোলাপদি ব'ললো, বিজন কি কুমুকে নিয়ে যাবে?

কোথায়? বিজন আশ্চর্য হ'য়ে গোলাপদির ও কৌমুদীর মুখের দিকে তাকালো।

ভাখো কথার ছিরি! গোলাপদি ন'ড়ে বসলো: কোথায় নিয়ে যাবে তা কি আমি জানি? তোমার দেশেও নিতে পারো, আবার—

সে কী কথা! বিজন পেয়ালা থেকে মুখ সরিয়ে ব'ললো: আমি আবার নিয়ে যাবো নাকি? কি যে বলো!

নিয়ে যাবেনা? তোমার জিনিষ তুমি নেবে না, তবে কি আমি চিরকাল আগ্‌লে থাকবো?

বিজন এর কোনো উত্তর দিলো না, না বা কৌমুদী। এর কী উত্তর হ'তে পারে তারা বুঝে পেলোনা। তবে, উত্তর একটা কিছু দেওয়া দরকার, নাহ'লে বক্তব্য অসমাপ্ত থেকে যায়।

বিজন ব'ললো, নিশ্চয়, নিয়ে যাবো বই-কি! চিরকাল আগ্‌লে থাকতে হবে না, গোলাপদি! তবে, আর কয়েকটা দিন।

হুঁ। গোলাপদির আনুনাসিক শব্দটায় বিস্তর রহস্য আছে মনে হ'লো।

কৌমুদী গোলাপদির দিকে আড়-চোখে তাকালো, কোনো কথা ব'ললো না।

বিজন একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলো। হয়ত ধূমপানের জন্তে নয়, হয়ত এখন আর একটি অবলম্বনের দরকার ছিলো। সিগারেটের

ধোঁয়ায় যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'লো, ধ'রে নেওয়া যাক্, তারি নেপথ্যে কোনো নাটক সুরু হ'য়ে গেছে, প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে যার আবির্ভাব আসন্ন। তুমি হয়ত বুঝতে পারলেনা, পঙ্কমি, আমি কি বোঝাতে চাই। তবে, বিজন-যে সে-নাটকের নট নয় এটুকু জেনে রাখলেই ঢের।

পরদিন বিজন স্বদেশে যাত্রা করলো।

কৌমুদী নতুন ক'রে সঙ্গীহীনতার বিষ হজম করতে আরম্ভ করলো। কিন্তু বোঝার ওপর শাকের-আঁটি আছে, দংশনের পরেও জ্বালা আছে নতুন নাটকের নায়িকা-বেশে গোলাপদি প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূতা হ'লেন।

নটীবেশে গোলাপকে তুমি ছাখোনি। আমিও দেখিনি। গায়ের গোলাপী রঙ্, ঠোঁটের রঞ্জন, চোখের অঞ্জন, পায়ের মখমলী হাল্কা লপেটাটি, সে যে এক স্বপ্নরাজ্যের ঘটনার মত ঠেকে, পঙ্কমি। ছিপছিপে দেহ, প্রতিটি কটাক্ষে অগ্নিবাণ, প্রতিটি নিশ্বাসে আশা আর নিরাশা, এই নাকি ছিলো গোলাপের বৈশিষ্ট্য। এরি জন্যে তার খ্যাতি নাকি বিস্তৃত ছিলো সর্বত্র। ঘুঙুর আর ঘাগ্‌রা প'রে যখন সে স্তাবকের সভায় মৃদু মৃদু নাচতো ও মোলায়েম ক'রে হাসতো, আর তবলার বোলের সঙ্গে ঠাণ্ডা সুরে ব'লতো: 'কুঁহুঁ নন্দলালা,—উঁহুঁ উঁহুঁ রোদয়তি, মরমে হামারি বিষ-জ্বালা!' তখন তার অভিনয় ক'রে কাঁদবার ঢঙ, তার সঙ্গে গায়ে মৃদু ঝাকানি দিয়ে 'উঁহুঁ উঁহুঁ' বলা কতজনকেই-না কাঁদিয়েছে! তার আসরে লোকের সংখ্যা ছিলো অগণ্য, কিন্তু তার বাসরে ঢোকার সৌভাগ্য লাভ ক'রেছে মাত্র ক'জন। কী খ্যাতি, আর কী সে প্রতিপত্তি! এই ছিলো গোলাপের পূর্বজীবন। তারপর ধীরে ধীরে বসন্ত গেলো ফুরিয়ে, চৈত্র শেষ। একে একে আলো এলো নিভে, হ'লো দিনান্ত।

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

গোলাপের শেষ-অধ্যায় গোলাপদি। এ-যেন নর্মদা-দেবী থেকে নর্দমা-দেবীতে প্রমোশন।

গোলাপদি জাহান্নমে যাক্, তা'তে আমাদের যায় আসে না। কিন্তু অন্য আরেকজনকে জাহান্নমে টান্‌তে আরম্ভ করলে আমরা ঘোরতর আপত্তি করবো। তুমিই-না একদা আমায় ব'লেছিলে পঞ্চমি, যেখানেই আমি তোমাকে নিয়ে যেতে চাইনা কেন, তুমি যেতে রাজি আছো, কিন্তু গোল্লায় বাদে। ও-স্থানটিকে তুমি ভয় কর, না, ঘৃণা কর তা' অবশ্য খুলে বলোনি। তবে সেখানে যেতে তুমি নারাজ। আমিও যেতে রাজি নই অবশ্য। আমরা যখন যেতে চাইনে, তখন কৌমুদীকেই-বা যেতে দেব কোন আক্কেলে? চলুক না গোলাপদির চক্রান্ত, আমরা দু'জন জীবিত আছি, আমাদের লেখনী এখনো বলবতী আছে, আমরা তা'কে ঠেকাবো। যেখানে খুসি সেখানে সে যাক্ বাধা দেবনা, কিন্তু সে যেন গোলাপদির সহযাত্রী না হয়।

সেদিন নাকি বর্ষা। সকাল থেকে অনর্গল বৃষ্টি পড়ছে। আমাদের মিনিয়েচার মনুমেণ্ট আর কলকাতার কেল্লা অন্য রূপ ধারণ ক'রেছে, আগাছার ভিড় ডুবে গিয়ে কেল্লাটা সমুদ্রে রূপান্তরিত হ'য়েছে, আর মনুমেণ্ট লাইটহাউস্‌এ। বৃষ্টি দেখে কাঠ-ঠোকরা লুকিয়েছে, লাইটহাউস্‌এর চূড়ায় ব'সে শিষ দিচ্ছে পাখী। কা'কে যেন সাবধান হ'তে বলছে। কৌমুদীকে, না, গোলাপদিকে? সংসারসমুদ্রই বলো, আর জীবনসিন্ধুই বলো, বিপদের অন্ত নেই এখানে; সতর্কতার সঙ্কেত মাঝে মাঝে পাওয়া ভালো।

কিন্তু এ সঙ্কেতে গোলাপদির হুঁস হ'লোনা। সে নিজের খেয়ালমত উদাসীন ভাবে এগিয়ে যেতে লাগ্‌লো। কৌমুদীও নিশ্চিন্ত মনে গোলাপদির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রেই পাল তুলে চলেছিলো, কিন্তু খেয়াল হওয়া মাত্র হাল

সে ঘুরিয়ে দিলো। আর এক মুহূর্ত দেরী হ'লে ভরাতরি ভরাডুবি না হ' যেত না।

কিছু বুঝলে? তোমাদের এই এক বদ-স্বভাব আছে, চট্ ক' সব কথা বুঝতে পারোনা। মাথার বাইরেটা তোমাদের বড্ড বাহা কিন্তু ভেতরটা সত্যিই সাহারা। বৃদ্ধ বার্নার্ড বুদ্ধিমতী মহিলার জন্যে গাই রচনা করেছেন। তাঁর দেশে বুদ্ধিমতী মেয়ের একবচন কেন বহুবচন হওয় হয়ত' সম্ভব, কিন্তু আমাদের একবচন ব্যবহার করতেই একাধিকব ভাবতে হয়। চাটুকথাই না হয় হ'লো: মাঝে মাঝে চাটুকথাটাও দরকা চাটনির মত: তুমি, অর্থাৎ শ্রীমতী পঞ্চমী দেবী, আমার কাছে সে একবচনী বুদ্ধিমতী। তুমি হয়ত' বুঝেছ, কিন্তু তোমার সগোত্র বান্ধবী দেব জন্যে আমাকে সব কথা খুলে বলতে হবে। বলা যায় না, হয় আমার এ চিঠি তোমার কাছে না পৌঁছে, সরাসরি তাঁদের আসরেই হাজি হবে। তোমার টাঙাইল-প্রীতি ও বন্ধু-প্রীতি বড্ড বেশি। তুমি তোমার দে মেয়েদের নিশ্চয় এ চিঠি দেখাবে। আমিও সেজন্যে প্রস্তুত হয়েই লিখছি।

লিখছি, কৌমুদীর সঙ্গেই লিখ্‌ছি। কৌমুদীরও রাত এখন দুপু আমার রাতও তদ্রূপ। আজ কৌমুদীর মনের অবস্থা ভালো না, আমা তথৈব। কৌমুদী বিজনকে চিঠি লিখ্‌ছে, অযথাই লিখ্‌ছে। সে জানে এ-চি ডাকে দেওয়া হবে না। বিজনের নিষেধ আছে। কৌমুদীকে বিজনের অ ভাবকেরা সুনজরে দেখেনা, না দেখারই কথা। কৌমুদীও তা অবশ্যই জানে সৃষ্টিছাড়া মানুষের মেয়ে ব'লে পরিচিত সে, তাকে সম্মান করতে কেউ চায়না কিন্তু নিষেধ সত্ত্বেও কৌমুদী বিজনকে মৃত্যু-সংবাদ জানিয়েছে, হয়ত সে ঠিক চিঠি পর্যায়ে পড়েনা ব'লেই। বিজন শাসনে মানুষ: ভয় তা তার বেশি, মনের জোর তাই কম। আজের চিঠি কৌমুদী ডা দেবেনা অবশ্য, অথচ লিখবে। কথা বলার লোক এমন কেউ নেই যা

কাছে সে মনের কথা খুলে বলে, অতএব তাকে এই পথ নিতে হ'য়েছে। কৌমুদী বিস্তর কথা লিখছে, মনের গ্লানি, মনের ময়লা সব সে কথা দিয়ে সাজাচ্ছে। কিন্তু অত কথায় আমাদের দরকার নেই। চিঠি লেখা তখনও শেষ হয়নি, কৌমুদী হঠাৎ গোলাপদির আচরণে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করলো।

কৌমুদী সশ্লেষে জিজ্ঞাসা করলো, গোলাপদি, খবর কি?

খবর আর কি দেব, ভাই! খবর আর কী আছে?

হঠাৎ ভাই-সম্বোধনে কৌমুদী হাস্‌লো। কিন্তু হাসিটা পরমুহূর্তে গেল মিলিয়ে। দরজার দিকে তাকাতেই সম্মুখে কৌমুদী যেন প্রকাণ্ড একটি সাপ দেখ্‌তে পেলো।

ওখানে কে? কৌমুদীর গলা দিয়ে ভয়ার্ত স্বর বের হ'লো।

মহিমবাবু। গোলাপদি নির্লিপ্ত জবাব দিলো।

তিনি কে?

কেন, চিনিস্ নে? কদ্দিন না বলেছি এঁর কথা, টাকায় পয়সায়—

বুঝেছি। কি চান্ উনি?

ন্যাকা সাজিস্‌নি, মাইরি। গোলাপদি দরজার দিকে তাকিয়ে অন্ধকারকে সম্বোধন করলো: ভেতরে আসুন, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? নে কুমু, আলাপ কর্।

তার মানে? কাকে ডাক্‌ছ তুমি ভেতরে?

জানিনে! আমি চ'লে যাচ্ছি, বাপু, বাড়ি থেকে। তোরা বুঝে নে। আস্কারা দিতে হয় দে, নইলে পথ দেখতে বল্।

তুমি কোথায় যাবে? কৌমুদী গোলাপদিকে জিজ্ঞাসা করলো।

আমি? কোথায় আর যাবো? ও-ঘরে। ন্যাখ কুমু, তেজ করিস্‌নি, নরম হ্। মেয়েমানষের তেজ অলক্ষ্মী।

জানি। আসুন মহিমবাবু, ভেতরে আসুন। কৌমুদী সহজভাবে উঠে

দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলো, গোলাপদির ওপর হঠাৎ চ'টে ব'ললো, অ
আক্কেল তোমার। আগে কিছু না ব'লে-ক'য়ে হাজির করতে হ
বড্ড বিপদে ফেলো তুমি।

মাহিমবাবু এলেন, নিঃসঙ্কোচে তিনি পাঞ্জাবীর গলা ঢিল দিতে দি
ঘরে প্রবেশ করলেন।

কৌমুদী ব'ললো, বসুন।

কৌমুদীর সর্বাঙ্গে সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে মহিমবাবু ধীরে ধ
অনুচ্চ মোড়ায় ব'সলেন।

বিনয়ে গলতে গলতে কৌমুদী ব'ললো, গরিবের বাড়ীতে এর চেয়ে
আসন আর নেই। কিছু মনে করবেন না।

কী যে বলো! মৃতের হাসি হাসলেন মহিম বাগচী। তারপর এ
বিব্রতভাবে চারদিকে তাকিয়ে: তুমি ব'সবে না?

ব'সবো বই-কি। কৌমুদী নিজের বিছানার ওপর ব'সে পড়লো।

মহিমবাবুও ধীরে ধীরে মোড়া থেকে নেমে বস্‌লেন। কৌমুদীর
কি আছে তা বোঝা গেল না, সে এতটুকু নড়লোনা পর্যন্ত।

চারদিকে চুপচাপ। পাশের ঘরের গোলাপদির নিশ্বাস বুঝি এ-ঘরেও শে
যাচ্ছে। রাত্রির এখন সবে শৈশব। আকাশে তারা কাঁপছে হয়
বাতাস হয়ত এখন স্তব্ধ। সুন্দরী গোলাপ এখন গোলাপদির সর্ব-শরী
ঘুঙুর বাজিয়ে নেচে উঠেছে: ঝুঁহুঁ নন্দলালা। কোথাও কিছু নেই, হঁ
ধীরে কোত্থেকে নিমেষের মধ্যে আকাশ ভ'রে আবার মেঘ ক'রে এ
গাছের পাতা কাঁপিয়ে বাতাস গেলো বয়ে, এলো ঝড়। কবাটে-কব
আঘাত উঠ্‌লো বেজে, ঘূর্ণিবাতাসে চারদিক হলো আচ্ছন্ন, পথ
রাখা যায় না। রাত্তির ক'রে পাখীরা পড়েছে বেরিয়ে, নিরাপদ আ
প্রশাখা নেই, শূন্যে পাক খাওয়া ছাড়া গতি নেই। এমন সময় হ

যদি পাখীরা বাসা পায়, কিংবা দূর সমুদ্রের নাবিক ধ্রুবতারা দেখতে পায়, তখন তাদের যতটা আনন্দ হওয়ার কথা,—আমাদের নায়িকার আনন্দ হ'লো, এই বিপদেও তার আনন্দ হ'লো, তার চতুর্গুণ।

অন্ধকারে মহিমবাবুর হাত ধ'রে কৌমুদী রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। প্রেতের মত কে-যেন তাদের অনুসরণ ক'রে ক্রমশই এগিয়ে আস্‌ছে। কৌমুদী পিছনে তাকাতে ভয় পেলো! মহিমবাবুর হাত চেপে ধরে সে ব'ললো, আমার ভয় ক'রছে।

ভয় কি? আমি আছি!

কোথায় যাবো আমরা?

এখনো ঠিক নেই।

কোন্ রাস্তায়, তাও ঠিক নেই?

ট্রেনে।

সদর সড়ক এড়িয়ে, কলেজের পিছনের পথ দিয়ে তারা চলেছে। তাদের পিছন-পিছন কে-যেন আস্‌ছে। এবার মহিমবাবু টের পেলেন। তিনি একটু থামলেন। ব'ললেন, কেউ না। চলো!

কিন্তু মহিমবাবুর ভুল হ'য়েছে। এখন তিনি প্রায় অন্ধ। অনুসরণকারী এবার অনেকটা কাছে এসে গেলো, আচম্‌কা মহিমবাবুর হাত ধ'রে ফেললো। ব'ললো, আমার টাকা।

কে তুমি? মহিমবাবু ভয়ার্ত চীৎকার করলেন।

চেনোনা আমাকে? তোমরা পালাচ্ছ, নিশ্চয় পালাচ্ছ।

পাগোল হ'লে নাকি, গোলাপদি? পালাবো কোথায়? মহিমবাবু পকেটে হাত দিয়ে বিস্তর নোট বের করলেন। কৌমুদীকে প্রলোভন দেখাবার জন্যে প্রয়োজনেরও অনেক বেশি তাঁকে সঙ্গে নিতে হয়েছে। ব'ললেন, এই নাও। খুসি?

উত্তরে কৌমুদীকে ব'ললো গোলাপদি : কৌমুদী, খুসি ?

নিশ্চয়। কৌমুদী জবাব দিলো : তোমার সুখেই আমার সুখ, গোলাপদি। তুমি তো এই চেয়েছিলে।

সুনীতিরোডে পৌঁছে তারা একটি গাড়ি নিলো। ট্রেনের তখন মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। গাড়োয়ান ঘোড়াকে নির্দয় চাবুক ক'ষে বাবুর ওপর সদয় ব্যবহার করলো। ঘড়ঘড় শব্দের ভিতরে কৌমুদী ব'ললো, অনেক দূর চ'লে যাবো কিন্তু।

কতদূর ? কৌমুদীর আব্দারকে প্রশ্রয় দিয়ে মহিমবাবু ব'ললেন।

যেখানে গোলাপদি নেই। যেখানে কেউ নেই।

গোলাপদিকে অত ভয় কেন তোমার ?

তাও জানোনা ? কী তুমি একটা !

মহিমবাবু বিজ্ঞের মত হাস্‌লেন। এত শিগ্‌গির তিনি এতটা ভালো-বাসা প্রত্যাশাও করতে পারেননি। এ-যেন তাঁর পাওনার চেয়ে অনেক বেশি পাওয়া হ'য়ে গেছে। ব'ললেন, তুমি এত মিষ্টি, তবু তোমার এই দুঃখ।

কই, দুঃখ আর আমার নেই তো ! কপালের চুল দু'হাতে সরিয়ে কৌমুদী মহিমবাবুর দিকে পরিপূর্ণ তাকালো। রাস্তার আলোয় দু'জন দু'জনকে সামান্য দেখতে পেলো। অনেক সময় সামান্যটাই অসামান্যতা লাভ করে।

আর এক মিনিট দেরী হ'লে ট্রেনটা ফস্‌কে যেতো। অদৃষ্ট-প্রসন্ন হ'লে সবই ফলে যায়। আজ মহিমবাবুর সকাল হ'য়েছে কার মুখ দেখে, তা তাঁর মনে নেই। তা না হ'লে তিনি তাকে পুরস্কৃত করতেন নিশ্চয়ি। ভালোবাসা দূরের কথা, প্রবেশাধিকার পাবেন কি না, এই ছিলো তাঁর সন্দেহ। এখন দেখছেন, তাঁর মত সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি দুটি নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় তাঁরা দু'জন মাত্র যাত্রী : কোন্ সুন্দর সুদূর দেশে তাঁর মধুযামিনী যাপনের সামিল ঠেকছে আজের এই যাত্রা।

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

তীব্রবেগে ছুটেছে রেলগাড়ি। অস্বাভাবিক হ'লেও মনে হচ্ছে, রেলগাড়িটা যেন কোনো এক অদৃশ্য আতঙ্কের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে প্রাণভয়ে কিংবা মর্যাদাহানির ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে। অস্বাভাবিক হ'লেও এ-কে অস্বাভাবিক ভেবোনা, পঞ্চমি। গাড়ির মধ্যে কৌমুদী মহিমবাবুর দিকে আড়-চোখে তাকাচ্ছে। বাইরে থেকে কামরার মধ্যে কৌতুকভরা দৃষ্টি দিয়ে আমরা তামাসাটা উপভোগ করছি।

কৌমুদী ব'ললো, বলো না লক্ষ্মীটি, কোথায় যাবো।

পাহাড়ে। সেই পাইন্‌বন, সেই ঝর্নার গান—

না না! কৌমুদী রীতিমতো মেয়েলি গলায় ব'ললো, পাহাড়ে আমি যাবোনা।

মহিমবাবু কৌমুদীর হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ব'ললেন, তবে কোথায় যেতে চাও বলো!

সমুদ্রে। কৌমুদী চোখ দু'টি স্তিমিত ক'রে ব'ললো, সমুদ্রের মতো জিনিষ আছে! আমি নকল সমুদ্র দেখেছি, আসল সমুদ্র দেখতে চাই।

তার মানে? মহিমবাবু কৌমুদীর দিকে একটু এগিয়ে ব'সলেন।

কৌমুদী মহিমবাবুর দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে ব'ললো, ব্রহ্মপুত্র। আমি ব্রহ্মপুত্র নদী দেখেছি। উঃ, কী ভীষণ, কী ভীষণ। চারদিকে সুধু জল, সুধু জল। সেও তো সমুদ্রেরই মতো, কিন্তু সত্যি তো সে সমুদ্র নয়। পাহাড় আর সমুদ্রে পার্থক্য কি জানো, একটা পাথর আরেকটা পাথার। পাথর বড্ড কঠিন,—আমি সমুদ্র দেখ্‌বো।

তাই চলো। পুরী। মহিমবাবু রাজি হ'য়ে গেলেন: ব্রহ্মপুত্রই তোমার মাথাটা খেয়েছে, মাথার মধ্যে সমুদ্রের স্বপ্ন ঢুকিয়ে।

হ্যাঁ, তা ঠিক। মাথাটা খেয়েছে বই-কি! একটু থেমে কৌমুদী ব'ললো, কিন্তু পুরী না।

তবে ?

বম্বে।

বেশ তো, তাই চলো। মহিমবাবু আরেকটু স'রে ব'সলেন, কৌমুদীকে নিজের দিকে আকর্ষণ করলেন।

ছিঃ। কৌমুদী সস্নেহ ভর্ৎসনা করলো : একেবারে ধৈর্য নেই। বোম্বাই চলো আগে।

বড্ড দূর সে। মহিমবাবু মুখ বিকৃত ক'রে ক্লান্ত গলায় ব'ললেন।

দূর ? পাগোল নাকি ? এসে পৌঁছলাম ব'লে। কৌমুদী মহিমবাবুর হাত ধরে ব'ললো : পাগ্‌লামি রেখে গল্প শোনো। ব্রহ্মপুত্র নদীর গল্প।

গল্প ভালো লাগে না এখন ! ছেলেমানুষের মতো মহিমবাবু ব'ললেন। মেয়েমানুষের কাছে পুরুষমানুষ ছেলেমানুষীই ক'রে থাকে অবশ্য, মহিমবাবু আবার ব'ললেন : গল্প এখন থাক্।

কী ক'রে তবে সময় কাটবে, বলো ! কৌমুদী অবুঝের মতো ব'ললো।

কী ক'রে ? কেন—

আবার ? ছিঃ ! ব'ললাম না, এখন নয়। সেই নদী, কী চওড়া আর কী লম্বা ! মস্ত মস্ত ঢেউ তুলে ব্রহ্মপুত্র ছুটেছে। দারুণ জোরে, রেলগাড়ির চেয়েও জোরে। স্রোতে কত লোক-যে কতদিন ভেসে গেছে, কে জানে !- আমার ইচ্ছে করে, সেই নদীতে সাঁৎরে বেড়াই, সুধু সাঁৎরে বেড়াই। কেন বলো তো। এ বদখেয়াল কেন আমার ? কৌমুদীর চোখ ছলছল ক'রে উঠ্‌লো।

মহিমবাবু ব'ললেন, এ নদী কোথায় দেখ্‌লে ?

কেন, গৌহাটীতে। তা-ও জানোনা, অদ্ভুত তুমি !

মহিমবাবু লজ্জিত হ'য়ে ব'ললেন, সত্যিই জানিনে। গৌহাটীতে ছিলে বুঝি তোমরা?

হুঁ। মর্মরমূর্তির মতো স্থির ও অপলক কৌমুদী শব্দ করলো।

মহিমবাবু কৌমুদীর ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে মূঢ়ের মতন ব'সে রইলেন।

গাড়ি জাংশনে এসে দাঁড়ালো। লালমনিরহাট। কৌমুদী উঠে গিয়ে জান্‌লায় মুখ দিয়ে বসলো।

কিছু খাবে?

উহুঁ।

ক্ষিদে পায়নি?

না।

মহিমবাবু ফিরে এসে নিজের জায়গায় বস্‌লেন। সেখান থেকেই আবার ব'ললেন, পার্বতীপুরে ভালো খাবার পাওয়া যাবে। সেই ভালো, সেখানেই কিছু খেয়ে নেব।

কৌমুদী কোনো উত্তর দিলোনা।

গাড়ি ছাড়লে কৌমুদী উঠে এলো, ব'ললো, শোও। ঘুমোও তো একটু! জেগে থাকলেই মাথায় বদবুদ্ধি আস্‌বে। ঘুমোও শিগ্‌গির!

অনুগত শিশুর মতো মহিমবাবু শুয়ে পড়লেন। কৌমুদী তাঁর মাথার চুল নাড়তে লাগ্‌লো। ব'ললো, বম্বে গিয়ে কাজ নেই, পুরীতেই চলো। সময়টা এগিয়ে নিলাম।

শুয়ে শুয়েই মহিমবাবু কৌমুদীর দিকে তাকিয়ে হেসে ব'ললেন, তোমার ধৈর্য বুঝি ক'মে এসেছে!

(দুষ্টু! কৌমুদী মহিমবাবুর গালে রীতিমত টোকা দিলো।)' ব'ললো, হ'য়েছে! এবার ঘুমোও তো।

কৌমুদীর আদর উপভোগ করতে করতে ও পুরীর সমুদ্রতীরের

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

রোমাঞ্চকর স্বপ্ন ও সম্ভাবনার কথা ভাবতে ভাবতে মহিমবাবু সত্যি সত্যিই অকাতরে ঘুমিয়ে পড়লেন। হাঁটুর ওপর থেকে মাথাটি নামিয়ে দিয়ে কৌমুদী স'রে ব'সলো ও ঘুমন্ত মহিমবাবুর নিরীহ মুখের দিকে তাকিয়ে হাস্‌লো। কৌমুদীর চোখে মহিমবাবুর নিদ্রিত মুখ উপভোগ্য দেখালো বোধ'য়। কৌমুদীর এই অদ্ভুত আচরণে তুমিও নিশ্চয় হাস্‌চো, পঞ্চমি। আবার তোমার হাসি দেখে আমারো-যে বেজায় হাসি পাচ্ছে। পৃথিবীতে প্রত্যেকেই নিজেকে বুদ্ধিমান ঠাওরায়।

বাঁকে বাঁকে ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটে চ'লেছে ট্রেন্। ঝাঁকে ঝাঁকে অজস্র চিন্তা কৌমুদীর মনে পাক খেতে আরম্ভ ক'রেছে: মনে মনে যে সংকল্প নিয়ে সে মহিমবাবুর সঙ্গে পালিয়ে এসেছে, তা সফল হবে কি না; সফল হবার পথে তার বিপদ কতকটা; গোলাপদি কেন তাকে এই অগ্নি-পরীক্ষায় ব্রতী করলো; তার ভবিষ্যৎ এখন তার নিজের হাতে, বেচারা মহিমবাবুর কোন দোষ সে দিতে পারে না; অথচ, সে নিজেও দোষী নয়। জান্‌লা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কৌমুদী ব'সে রইলো। ট্রেনের গতি অন্ধকার রাস্তার মধ্যে মন্থর হ'য়ে আস্‌চে, সঙ্গে সঙ্গে কৌমুদীর বুকের আন্দোলন দ্রুত হ'য়ে উঠ্‌ছে। বার বার সে তাকাচ্ছে মহিমবাবুর ঘুমন্ত মুখের দিকে। তার হাত-পা যেন কাঁপছে! দূরে তাকিয়ে দেখ্‌লো, সিগনালের লাল আলো অন্ধকারের মধ্যে আগুনের মতো জ্বলছে।

পরিষ্কার না পেয়ে মাঝপথেই গাড়ি দাঁড়ালো। নিশ্বাস বন্ধ ক'রে মহিমবাবুর দিকে স্তব্ধ দৃষ্টি রাখ্‌লো কৌমুদী। আলকাৎরার মতো কুৎসিত রাত্রি। এটা লোকালয় না শ্মশান—বলা যায় না। কিন্তু কৌমুদীর অত বিচার করার সময় এ নয়। আমাদেরও কৌমুদীকে বিচার করার সময় আসেনি। অতএব তার যা খুসি সে এখন করুক, আমরা সে সম্বন্ধে নীরব থাকি। গাড়ি থেমে আবার গাড়ি চ'লে যাক্, উপস্থিত

আমরা সে-দিকে মন দেব না। যত অঘটন ঘটা সম্ভব, ঘটুক। আমি নিরিবিলি চিঠি লিখি তোমাকে। তোমার গত বারের লম্বা চিঠির তাগাদায় তুমি কবিতা ক'রে যে-সব ভণিতা করেছ, তা আমার মতো কাঠ-খোট্টা লোকের ধাতে সহ্য হয় না, তাব'লে তা'কে আমি অসহ্য বলে উড়িয়ে দিতে পারিনে তো! তার উত্তরে স্থধু লিখ্‌তে পারি:

তুমি সবি জানো: অনাবশ্যক ক্ষতিতে
অনেক বোঝা-ই হাল্কা করেছি অতীতে।
আজের কাজের ভিড়ে ডুবে যাই যত-না—
ক্ষতিকে খতিয়ে দেখি ক্ষতি মোটে ক্ষত না।
মনোহর মোহ এর আগে যদি ছাড়িত
লাভ লোকশান ঘুচে যেত অবধারিত।

কিংবা

পান্থশালায় প'ড়ে আছি, উপঢৌকন চায় দেবতা।—
দেবতাকে বলি: আমি যাহা দেব, শতগুণে ফিরে নেব তা।
মৌনে দেবতা সম্মতি দেয়, ভরসায় ভেট পাঠিয়ে
শেষবেশ দেখি, ঠ'কেছি: দেবতা পালিয়েছে পাশ কাটিয়ে।
লাভে মূলে সব হারিয়ে এবং সম্বল সব খোয়ায়ে
দেবতার দ্বারে ব'সে আছি তবু সম্ভ্রমে মাথা নোয়ায়ে।

ঠিক এই লাভে লোকশানের কথা ভেবে ভেবে যখন আমি সারা হ'য়ে এসেছি তখন তোমার চিঠিটা পেলাম: মস্ত চিঠি লেখার আদেশ। এ-আদেশে উপকৃত হ'য়েছি, কেননা মেজাজটা কিছুদিন থেকে বড্ডই কাহিল এবং কাহিল মন-ই রচনা করার উপযুক্ত মন। কিন্তু লিখি কী? কথা আছে বিস্তর, কিন্তু তোমাকে লেখার মতো কথা আমার যেন নেই। কিন্তু কথার খেই তুমিই ধরিয়ে দিয়েছ—কৌমুদী সম্বন্ধে অজস্র কথা জিজ্ঞাসা ক'রে বিবিধ প্রশ্ন পাঠিয়ে; তার উত্তর আমাকে গল্পের

ছলে দিতেই হবে। তাই দিচ্ছি। কিছুক্ষণের জন্যে আমরা কৌমুদীকে একা ফেলে স'রে এলাম। কারণ তার কথা ব'লতে ব'লতে আমরা দু'জন বড় তফাতে প'ড়ে যাচ্ছিলাম। এই মুহূর্তে দৈনিক কাগজের প্রেরিত দূতের মতো যদি ছুটে গিয়ে তা'কে জিজ্ঞাসা করা যায়, তার কিছু বক্তব্য আছে কি না। দ্রুত গতিতে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে নিশ্চয় সে ব'লবে :

জীবনে এসেছে মোর বহুবিধ বিকার—
দুঃখের কী-বা কব, ঝুলি নেই ভিক্ষার !

সত্যিই তাই। খালি হাতেই তার এই যাত্রা। যাত্রার শেষ কোথায়, প্রথম বন্দর কত দূরে, সে জানে না। এই লাইন দু'টো টুকেই দূতকে বিদায় নিতে হবে।

যা বলছিলাম। আমরা তফাতে পড়ে যাচ্ছিলাম। যখন তোমার কবিতাপূর্ণ তাগাদাটা পেলাম তখন আনন্দ হ'লো দারুণ। একটা চিন্তা এতদিন মনের মধ্যে বিশ্রী কলরব সুরু ক'রেছিলো। ফলে, মন একেবারে তেতো ঠেকছিলো। এমন সময় বহুদূর থেকে সহস্র প্রশ্নের শেষে তোমার কয়েকটি ছোটো ও সাধারণ কথার শেষে তোমার নিজস্ব স্বাক্ষরটি পেয়ে আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লাম। এতদিন ভাবছিলাম, আমি কে ? সত্যিই যেন জানিনে, কে আমি। তোমার চিঠিটা পাওয়ার পর প্রশ্নটা মোড় ঘুরে দাঁড়ালো, মনে হ'লো : তুমি কে ?—যে আমার মনের এতগুলো আবর্জনা ঠেলে নির্বিবাদে বাইরে বেরিয়ে এলো ? সত্যি বলতে কী, তুমি কে তা আমি জানিনে। তোমাকে যদি বধূ বলি তাহ'লে একেবারেই মিথ্যে বলবো, বন্ধু বল্‌লে বেশি বলা হয়ে যাবে, প্রতিবেশী তুমি আমার নও—তবে যদি পরিচিত বলি তাহ'লে-যে কিছুই বলা হ'লোনা ! পরিচিত তো মানুষে কত রকমে হ'তে পারে :

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

ট্রেন-এ যেতে যেতে, পথ চলতে চলতে, হঠাৎ একদিন উপকার ক'রে ফেলে, এমন কি জীবনে কখনো দেখা না হ'য়ে পর্যন্ত। এক কথায়, পরিচিত কথাটির নিজস্ব কোনো পরিচয় নেই। এ যেন অন্য কোনো কথা পাওয়া গেলোনা ব'লে নিতান্ত দয়া ক'রে তাকে ওই আখ্যা ভিক্ষারূপে দেওয়া। কথাটির মধ্যে দীনতা বড় বেশী স্পষ্ট। পরিচিত-কথাটি যেমন নিঃসম্বল, বন্ধু-টি আবার ঠিক তার বিপরীত। আর বধূ, সে-কথা উচ্চারণ করায় ব্যক্তিগত পরাধীনতা আছে এবং আইনের ভয় আছে। কিন্তু তুমি কে, তার উত্তর তুমি না দিলেও, এবং আমি কথা দিয়ে নানা কৌশল খাটিয়ে প্রকাশ করতে না পারলেও মনে মনে উপলব্ধি ও সঙ্গে সঙ্গে অনুভব অবশ্যই করতে পারছি। বহু দূরে বসে তুমিও হয়ত এই একই :কথা নিয়ে খেলা করছো, ভাবছো: তুমি কে, আমি কে? মনে ক'রে রাখো, অবশ্য নিরুপায় হ'লে উপায় থাকে না ব'লেই মনে ক'রে রাখো: আমরা দু'জন দু'জনের যা-ই হই-না কেন, তা যেন বাইরে প্রকাশ না হয়, তবে দু'জন দু'জনের একটা-কিছু। ছাখো কাণ্ড, সব গোপন করতে গিয়ে সব-যে প্রকাশ ক'রে ফেললাম। এই কথাটা কিন্তু বড় অসাবধান। কথাটা শত্রুর প্রলোভন বলা যেতে পারে। তাদের অনুসন্ধিৎসা বাড়াবার এ-যে টনিক। তুমি যদি বলো, তোমার শত্রু নেই—আমি কিন্তু সে-কথা বিশ্বাস করবো না। মানুষের শত্রুপক্ষ ব'লে যদি কোনো ঐশ্বর্য না থাকে, তাহলে মানুষ বাঁচবে কী ভাঙিয়ে? শত্রু মানুষের মূল্যবান সম্পদ। উপকারীর ওপর আমার আস্থা কম। তাদের মতো অমন বেকুব তুমি পৃথিবীতে আর পাবেনা। তুমি অসুবিধেয় প'ড়েছ, অমনি সে এসে তোমাকে একটু সুবিধে দিয়ে গেলো; হাতে অনেকগুলো জিনিষপত্র নিয়ে ট্র্যামে উঠ্‌তে পারছোনা, তোমার হাতের জিনিষপত্র নিয়ে তোমাকে তুলে নিলো; টাঙাইলের টিকিট কাটবে,

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

স্টেশনে অসম্ভবরকমের ভিড়, বললো, আসুন না আমিও তো টিকিট কাটবো, এক সঙ্গে দু'টো।

আমি স্বীকার করছি, তোমার মত ভাল মানুষ নেই, কিন্তু সেই জন্যেই তোমার-যে শত্রু নেই সে-কথা স্বীকার করি কেমন ক'রে? জানো তো, ভালমানুষ-হওয়া আর শত্রু-সংখ্যা সম-দ্রুততায় বাড়ে। বাড়ির মধ্যে সব চেয়ে যে ভালো ছেলে বাড়ির শাসনের ভাগ তাকেই পেতে হয় বেশি ক'রে। হাজার ভালোমানুষ হ'লেও শত্রু তোমার আছে। সেই শত্রুর শক্তি বৃদ্ধি করে লাভ নেই: একটা-কিছু যদি আমরা পরস্পরের হই, তবু তা প্রকাশ করবো না। ধরো, আমরা দু'জন দু'জনের অবলম্বন। এই রে, সহজ করে বলতে গিয়ে একটা ভয়ানক কথা ব'লে ফেললাম দেখছি। এর চে খোলাখুলিভাবে বধূ বলাও অনেকটা নিরাপদ ছিলো মনে হচ্ছে। অবলম্বন? তার মানে? দু'জন দু'জনের ওপর নির্ভর করে আছি? কি জন্যে? কই, জানিনে তো! অবলম্বন কথাটা যেমন ছোটো, বড়ও সেই অনুপাতে। একটা ছোটো আল্‌পিন এক টুকরো কাগজের অবলম্বন হ'তে পারে, এই প্রকাণ্ড পৃথিবীটা আধুনিককালের এই বিপুলকায় যন্ত্রশালার একটি অবলম্বন। কিন্তু এ তো গেলো সোজার ওপর দিয়ে, এর মধ্যে কোন মারপ্যাচ পেলামনা। কিন্তু যে মুহূর্তে আমি তোমাকে অবলম্বন ব'লে সম্বোধন করলাম, তৎক্ষণাৎ সমস্ত বিশ্বের বিশ্বাস হ'লো আমরা অবিশ্বাসী। আমরা দু'জন তবে দু'জনের কী? একটা উপসর্গ? হয়ত তা হবো। যদি তোমাকে নিয়ে কবিতা করা সম্ভব হ'তো—তাহ'লে বলতাম, তুমি আমার কাব্যের মন্দাক্রান্তা, আর আমি তোমার কাব্যের কবি। কবি ব'লে তুমি যদি স্বীকার না-ই করো, অন্তত তোমার চিঠির পাণ্ডুলিপিকার ব'লে নিশ্চয় মানবে। কারণ, জনসমাজে তোমাকে পরিচিত করার জন্যে আমি একদা তোমার বিষয় বলতে গিয়ে

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

প্রথমেই ব'লেছি : জিভে জড়তা নেই ॥ যার সঙ্গে মিল রেখে তুমি আমাকে পাল্টা আক্রমণ ক'রে লিখেছ : নিবে জড়তা নেই ॥ অর্থাৎ কলম আমার থামেনা। আমি নাকি লিখে যেতে পারি অনর্গল ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তুমি যেমন জড়তাহীন জিভ দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'কে যেতে পারো। কিন্তু এখন যেহেতু তুমি আমার কাছে নও, তোমার কথা বলার সুযোগ নেই তোমার জিভ্ এখন অকর্মণ্য ; এবং যেহেতু তুমি দূরে, আমার লেখার সুযোগ আছে যথেষ্ট, আমার নিব্ এখন কর্মমুখর।

পরের স্টেশনে গাড়ি ব্রেক ক'ষে দাঁড়াতেই ছোট্ট ঝাঁকি খেয়ে মহিমবাবুর ঠুন্‌কো ঘুমটি ভেঙে গেলো। চারদিকে তিনি তাকালেন। তাঁর আশেপাশে জনপ্রাণী নেই। হঠাৎ চাবুক খেয়ে তিনি যেন চম্‌কে উঠ্‌লেন। নিশ্চয় এ তাঁর স্বপ্ন নয়, তিনি নিশ্চয় জেগেছেন। তবে, সব তাঁর অদ্ভুত ঠেকছে কেন? তিনি স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলেন—হয়ত কয়েক সেকেণ্ড কিংবা কয়েক মিনিট ; সময়ের মাপ বোঝার সময় এ তাঁর নয়। হঠাৎ কি খেয়াল হ'লো, তিনি উঠে ল্যাভেটরীর দরজা খুললেন : স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলেন, সেখানেও কেউ নেই। তিনি স্বপ্ন দেখছেন, গাড়ি আবার কখন চলতে আরম্ভ করেছে, তা তিনি জানেন না। অদ্ভুত! মহিমবাবু মাথায় হাত দিলেন, চুল এলোমেলোই তো মনে হচ্ছে। মেয়েটা তাঁকে আদর করছিলো না? তাই তো তাঁর মনে পড়ে। তবে এমন অস্বাভাবিক ঠেকে কেন? আয়নায় দাঁড়ালেন। হ্যাঁ, তিনিই—স্বয়ং মহিম বাগ্‌চী। গালের এইখানেই-না একটু মোলায়েম টোকা খেয়েছেন তিনি। কিন্তু কোথায় সে? টোকা-র সঙ্গে বোকা-র কাব্যগত একটা মিল তাঁর মনে পড়ছে বটে! অথচ তা সম্ভব নয়—এই তাঁর ধারণা। যাক্‌গে। তিনি বস্‌লেন। কিন্তু বস্‌লে চল্‌বে কেন? উঠে দাঁড়ালেন। আচ্ছা মুস্কিল তো! গেলো কোথায়? তাঁর ঘুমের

সুযোগ নিয়ে কোনো শয়তান তাকে নিয়ে পালাতেও তো পারে। কিন্তু মাঝে তো আর কোনো স্টেশন ছিলো না—তাঁর হিসেব মত তো তা-ই মনে হয়। একি, ট্রেন-যে তাঁকে অযথা টেনে নিয়ে চ'লেছে! লাফিয়ে পড়বেন নাকি বাইরে? মহিমবাবু নিরুপায় হ'য়ে চেন্ টান্‌লেন।

চেন্‌এ টান পড়া মাত্রই ট্রেন্ দাঁড়িয়ে যাবে, বিজ্ঞান এমন ব্যবস্থা করেনি; কিন্তু মহিমবাবু সেই ব্যবস্থারই পক্ষপাতী, অন্ততঃ উপস্থিত তিনি পক্ষপাতী না হ'য়ে পারলেন না। দাঁড়াতে দাঁড়াতেও গাড়ি অনেকটা এগিয়ে এলো। যখন সত্যিই গাড়ি দাঁড়ালো, এবং গাড়ীর অধ্যক্ষ ও সহযাত্রীরা যখন নানারকম প্রশ্ন সুরু করলো, তখন মহিমবাবু সমস্ত বক্তব্য ভুলে গেলেন।

অজস্র প্রশ্নের একটি মাত্র অর্ধসমাপ্ত উত্তর দিলেন তিনি: আমার পার্স—

কত ছিলো? পড়লো কি করে? হাতের লাল আলো শাদায় রূপান্তরিত করতে করতে বাঙালী গার্ড ব্যস্ততা দেখালেন।

মহিমবাবুর সে-ব্যস্ততায় মন উঠ্‌লোনা। নিতান্ত বিরক্তির সঙ্গে তিনি বল্‌লেন, যাক্‌গে। ট্র্যাশ! চলুন!

ব্যাগে ছিলো কত? গার্ডই প্রশ্ন করলো।

বিস্তর। ধরুন, যথাসর্বস্বই হয়ত। মহিমবাবু রীতিমতো সজ্ঞানে বললেন।

কখন পড়লো?

টের পাইনি। ঘুমিয়ে ছিলাম। জেগে দেখি, নেই।

বলেন কী? আর কোনো প্যাসেঞ্জার সঙ্গে ছিলো না?

মহিমবাবু একটু ভাবলেন, ভেবে বললেন, না। আমি একাই ছিলাম।

কৌমুদীর নামগন্ধ করার ক্ষমতাও তাঁর নেই। বে-আইনী কাজ করার এই এক মস্ত অসুবিধে। মর্মে মর্মে মহিমবাবু এই মুস্কিলের কথা ভাবলেন, কিন্তু মুস্কিল আসান আর হ'লো না। ভেবে চিন্তে তৈরি না হ'য়ে কাজ করলে এমন বিপদেই পড়তে হয় বুঝি। নাঃ, কৌমুদীর পালাবার আগ্রহটা বড়ই প্রবল ঠেকছিলো তাঁর প্রথম থেকে, প্রথমেই সে প্রস্তাব ক'রে বস্‌লো : চলো পালাই॥ মেয়েদের পালাই-পালাই বাইটাই খারাপ।

মহিমবাবু গাড়িতে আবার চেপে বস্‌লেন। তাঁর মস্তিষ্ক ও মাংসপেশী যেন তাঁকে চলাচ্ছে ও বলাচ্ছে না, একটা অদৃশ্য যন্ত্রের প্রভাবে যেন তিনি চল্‌ছেন ও বল্‌ছেন। গাড়ি ছেড়ে দিলে তাঁর জ্ঞান আবার টনটনে হ'য়ে উঠ্‌লো : তাই তো! আর সব কামরা একবার খানাতল্লাসী ক'রে দেখা তাঁর উচিত ছিলো। যাবে কোথায় সে? নিশ্চয় সাম্নের কিংবা পিছনের গাড়িতে সে আছে। আর, যাবেই-বা সে কেন? এইবার স্টেশন এলে তিনি আর একবার খুঁজবেন।

কিন্তু মহিমবাবুর এ আশা দুরাশা ছাড়া আর কী, পঞ্চমি? আমাদের নায়িকা কৌমুদী এখন মহিমবাবুর অনেক পিছনে লাইনের পাশের পায়ে-হাঁটা রাস্তা ধ'রে ট্রেনের উল্টো দিকে ছুটে চ'লেছে। কে যেন তার পিছনে পিছনে আস্‌চে। কৌমুদীর ভয় করছে বড্ড। যাবে কোথায় সে? তা সেও জানেনা। গন্তব্যস্থান তার নেই। অন্ধকার রাত, অন্ধকারের মধ্যে লোহার লাইনগুলো বিষধর সাপের মতো চক্‌চক্ করছে। কৌমুদী ছুটে চ'লেছে অনেকক্ষণ থেকে। লোকটা তার পিছু কিছুতেই ছাড়ছেনা। বড় মুস্কিল তো! হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ালো : কে তুমি? কিন্তু গলার স্বর তার বের হ'লোনা। ভালো ক'রে তাকাতেই কৌমুদী স্পষ্ট চিন্‌তে পারলো, সম্মুখে সশরীরে সনাতন দাঁড়িয়ে।

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

কৌমুদী যেন ডাক্‌লো : বাবা।

সনাতন ব'ললো, হ্যাঁ রে, আমি।

তুমি কেন ?

কেন ? এমনি ! স্পষ্ট সনাতনেরই গলার স্বর।

ব্যস্‌। এইটুকু মাত্র কৌমুদীর মনে পড়ে। তারপর আর এতটুকু তার মনে নেই। জ্ঞান হওয়ার পর সে দেখ্‌লো, একটি বাড়ির বারান্দায় তাকে শুইয়ে রাখা হ'য়েছে। তার চোখের সাম্নে খাঁচায় ঝুলছে ময়না। উঠোন ভর্তি শলুপ শাক আর লাউয়ের মাচা। মাথার কাছে ব'সে হাওয়া করছে একটি মেয়ে।

কৌমুদীকে তাকাতে দেখে মেয়েটি চুপ ক'রে উঠে গেলো। এবং তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে বস্‌লো। অবিলম্বে আবির্ভাব ঘট্‌লো এক বৃদ্ধের। ইনি এ-বাড়ির মালিক। নাম একটা আছে, তবে পোদ্দার ব'লেই এঁর খ্যাতি।

পোদ্দার কৌমুদীকে ব'ললো, মাগো, একটু বল্‌কা দুধ খাও, কেমন ?

কৌমুদী এর কোনো উত্তর দিতে পারলোনা। তাকিয়ে তাকিয়ে সে দেখ্‌তে পেলো, এক এক ক'রে ক্রমশই ভিড় জমছে। তার নিকটতম অতীতকেও তার মনে হ'চ্ছে সুদূর স্বপ্নের মতো। কাল যা ঘ'টেছে তা যেন গত বছরের ঘটনা। নিঃসংকোচে সে ভিড়ের প্রতিটি মানুষের মুখের দিকে তাকাচ্ছে, এদের মধ্যের সামান্য একজনও যদি স্বয়ং মহিম-বাবু হন তাহ'লেও তার যেন তার বিরুদ্ধে বিন্দুবিসর্গ আপীল নেই। কিন্তু যদি সনাতন তেমনি সশরীরে এখন তার সাম্নে এসে দাঁড়ায়, কৌমুদী সাগ্রহে সে স্বপ্নকে সত্য ব'লে গ্রহণ করতে রাজি। এবার সে আর চেতনা হারাবে না কিছুতেই।

পোদ্দারের অনুনয় ও বিনয়ে ভিড় ধীরে ধীরে পাৎলা হ'য়ে গেলো।

পোদ্দারগৃহিণী প্রকাণ্ড নথ নাকে দিয়ে দুধের বাটি হাতে পাশে এসে বস্‌লেন। ব'ললেন, বাছা আমার!

মাত্র দু'টি কথা। কিন্তু কৌমুদী এতেই অভিভূত হ'য়ে পড়লো। তাঁর মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকাতে তাকাতে কৌমুদী উঠে বস্‌লো। ব'ললো, আপনারা কে?

তুমি কে বাছা? নাকের কাছ থেকে কাপড়ের পাড় সরিয়ে পোদ্দার-গৃহিণী জিজ্ঞেস করলেন। নিজের কি পরিচয় কৌমুদী দেবে ভেবে পেলোনা। কৌমুদী আবার ব'ললো, এ জায়গাটার নাম কি?

মেয়েটা ব'ললো, সোনামুখী।

তোমার নাম? কৌমুদী মেয়েটাকে প্রশ্ন করলো।

শিবানী। তোমার নাম?

কৌমুদী একটু থেমে ব'ললো, পূর্ণিমা।

রূপখানা তাই বটে! পোদ্দারগৃহিণী কৌমুদীর মুখের দিকে সপ্রশংস তাকিয়ে আবার ব'ললেন, তা বাছা, তোমার আর কেউ নেই? কোত্থেকে এলে?

আমাকে পেলেন কোথায় আপনারা?

পথের ধারে। অজ্ঞান হ'য়ে যেখানে পড়ে ছিলে, সেখানে। কোথায় যাচ্ছিলে, মা? এ দুর্গতি হ'লো কি ক'রে?

কৌমুদী তার জীবনের দিকে পিছন ফিরে তাকালো মুহূর্তের জন্যে, স্মিত হেসে ব'ললো, দুর্গতি আবার কি? এই ভাবেই তো আমার জীবন কাটছে। নাঃ, বাপ-মা কেউ নেই আমার। আমি অমনি ঘুরে বেড়াতেই ভালোবাসি। অজ্ঞান হয়েছিলাম বললো কে? আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। পথের মধ্যে যদি রাত্তির হয়, পথ ছাড়া আর ঘুমাবো কোথায়? থাকি! যেখানে থাকার জায়গা পাই সেখানেই থেকে যাই। সুবিধে বুঝলে বেরিয়ে পড়ি রাস্তায়।

তুমি বুঝি সন্নেসী? মেয়েটি সবিস্ময়ে বললে।

কৌমুদী হাস্‌লো : সন্ন্যাসীর নাম কখনো পূর্ণিমা হয়?

কেন হবে না! আমার কাকার নাম তো প্রাণবল্লভ, তিনি তো কবে সন্নেসী হ'য়ে বেরিয়ে গেছেন। মেয়েটি সরল গ্রাম্য ভাষায় ব'লে গেলো।

কৌমুদী উত্তরে কী যেন ব'ল্‌তে গিয়েছিলো, কিন্তু পোদ্দারগৃহিণী বাটিটা তুলে ধরে ব'ললেন : খেয়ে নাও! ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।

দ্বিরুক্তি না ক'রে নিঃশেষে দুধটুকু সে খেয়ে ফেললো।

কাছেই তিস্তা। পোদ্দার ধানের ব্যবসায়ী। গোলা ভর্তি ধান সে নৌকায় ক'রে চালান্ দেয় এদিকে ওদিকে। তাছাড়া সে আধি-দারও বটে। ক্ষুদে জমিদারদের জমি তার তত্ত্বাবধানে থাকে। চাষ-আবাদ করে ও জন-মজুর খাটায় সে, ফসলের অর্ধেকটা জমির মালিকের বরাদ্দ, অর্দ্ধেকটা ওর।

শিবানীর সঙ্গে কৌমুদী নদী থেকে চান সেরে এলো। শিবানীর বিবিধ প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে কৌমুদী প্রায় হয়রান হ'য়ে পড়েছে। প্রশ্নগুলো এত সরল যে তার জবাব জটিল না হ'য়ে পারেনা।

বিয়ে হয়নি তোমার?

কৌমুদী উত্তরে বললো, কেন বলো তো? অনেকদিন তো বিয়ে হ'য়ে গেছে। তোমার?

আমারো। কিন্তু তোমার হাতে লোহা, সিঁথেয় সিঁদুর কই?

তাও তো বটে! কৌমুদী সহাস্যে বললো : তা তো মনে নেই! তোমার নেই কেন?

কথাটা ব'লেই কৌমুদী থতমত খেয়ে গেলো : অজানিতে সে অশোভনীয় প্রশ্ন ক'রে বস্‌লো বুঝি!

মেয়েটি বললো, খুইয়েছি। যে না আমার স্বামী তার আবার লোহা, তার আবার সিঁদুর!

তার মানে?

মাতাল ভাই এক নম্বরের। তার ওপর—

তার ওপর কী? কৌমুদী শিবানীর মুখের ওপর একটু যেন ঝুঁকলো।

তার ওপর বলে কিনা আমি নষ্ট মেয়ে। আমি বলি—না। আমার কথা পেত্যয়ই করে না।

সত্যি? তারপর?

গণেশদার কাছে যুক্তি চাইলাম, সে বললে—যাস্‌নে। আমি আর যাইনে।

স্বামী নিতে আসে না?

উহুঁ!

গণেশদা কে?

সে আছে, বল্‌বোনা! শিবানী রঙ্গ ও রসিকতা ক'রে রহস্য গোপন করলো।

ছু'পাশে গাছ, মাঝখানে কাঁচা রাস্তা। নদী থেকে এই পথে আসাই সুবিধে। তারা ছুই বন্ধুতে ধীরে ধীরে চ'লে আস্‌চে। এদের ছু'জনের পরিচয় যেন অনেক কালের। ছু'জনের কাছে ছু'জনের যেন এতটুকু সংকোচ নেই। এত শিগ্‌গির তারা এমন ভাবে খাপ খেয়ে যাবে, ভাবিনি। তোমার কাছে হয়ত কিছুটা অস্বাভাবিক ঠেক্‌ছে, কিন্তু লিখতে লিখতে আমি তা এতটুকু বুঝতে পারছিনে।

সুধু শিবানীর সঙ্গে কেন, এই পরিবারের সঙ্গেও কৌমুদী মোলায়েম ভাবে খাপ খেয়ে গেছে। এ আশ্রয় তার যেন ছাড়ার ইচ্ছে নেই। কিন্তু সত্যি তো তা নয়। তার প্রথম ইচ্ছে ছিলো, গোলাপদির চক্রান্ত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া। তারপর বিজন? বিজনের কাছে তার পৌছন দরকার। কিন্তু আজই তো আর রওনা হওয়া চলে না। বিজন আগে

প্রস্তুত হোক্, কয়েকটা বছর সে এই ভাবে কাটিয়ে দিতে পারবে, এটুকু আশা তার আছে। এখন সে বিজনকে বিপন্ন করতে রাজি নয়। তা ছাড়া, বিজন যদি নিজে থেকেই আগ্রহ দেখায়, কৌমুদীই তা-তে বাধা দেবে। বিজনের ভবিষ্যৎ ব'লে যে জিনিষটা অন্ধকারে বাতুড়ের মতো ঝুলছে, সে ভবিষ্যতের ওপর সকালের আলো পড়ুক—ততদিন কৌমুদী কোনো রকমে ধৈর্য ধ'রে থাকতে পারবে। অজ্ঞাতবাস ক'রে কাটালে ক্ষতি কি? ইতিমধ্যে বিজন নিশ্চয় তাকে ভুলে যাবে না, অবশ্য কথার যদি তার দাম থাকে। আর এটুকু বিশ্বাস বিজনের ওপর তার আছে। কিন্তু ক্ষতি হ'লো তার একদিক থেকে, বিজনের সংবাদ সে আদপেই পাবে না। একদিন আচমকা কৌমুদী যদি বিজনের সম্মুখে হাজির হ'তে পারে একটানা কয়েকটা বছরকে এক ডুবসাঁতারে পেরিয়ে—তা হ'লে মন্দ কি? মনে মনে এই রকম যুক্তি খাটিয়েও সে নিজেকে চাঙ্গা রাখ্তে পারলো না। তিস্তানদী দেখে তার ব্রহ্মপুত্রের কথা অনবরতই মনে হয়। ইচ্ছে করে, এই নদীর কিনার ধ'রে ধ'রে সে হাঁট্তে আরম্ভ করে। একদিন নিশ্চয় গৌহাটীর নাগাল পাবে। সবই তো সে চেনে সেখানকার। গভীর রাত্রে গিয়ে সে চুপে চুপে বিজনের শোবার ঘরের জান্লায় টোকা দিয়ে ডাকবে: বিজনদা, জেগে আছো?

জেগে, না, ঘুমিয়ে পুন্নিমেদি?

এই যে শিবানী, এসো। জেগেই আছি, ভাই। কৌমুদী স'রে শুলো। বললো, ব'সো। এতক্ষণ ছিলে কোথায়?

তোমার যেন শরীর খারাপ, আমার তো খারাপ নয়; মহাভারত শুনছিলাম আর কুটনো কুটছিলাম। শিবানী ব'সে পড়লো।

কে, পড়ছিলো কে?

গণেশদা।

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

চলে গেলো নাকি ?

উহুঁ। ভারি সুন্দর সুর ক'রে পড়ে কিন্তু। সমস্কিত জানে কি না। বা রে, ও যে কব্‌রেজি শেখে। শিবানী সগর্ব ঘোষণা করলো।

তুমি পড়তে পারো না ?

পারি। কিন্তু পড়িনা, লজ্জা করে। অমন সুর কিছুতে বেরোয়না গলা দিয়ে।

কৌমুদী একটু হাস্‌লো : ভারি মজা তো !

সত্যি !

কৌমুদীর গলা দিয়েও সুর কিছুতে বেরোয়না—সনাতনের পালিতা বটে, তবু নয়। বিজন তাকে কতদিন গান শিখতে বলেছে। কিন্তু বিজনের অনুরোধ রাখ্‌তে না পারায় তার মনে দুঃখ আছে বটে, কিন্তু সে দুঃখকে মর্যাদা দেওয়ার মতো সঙ্গতি এখন তার নেই। এখন সে নতুন উপদ্রব নিয়ে ব্যস্ত: বিজনের কাছ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প'ড়েছে, কী ক'রে এখন সে বিজনের নৈকট্য আয়ত্ত করবে—এই তার মহা সমস্যার বিষয় এখন। আজ কোথায় বিজন, কোথায় সে। এতটুকু ভাববার সময় সে পেলোনা, গোলাপদি তাকে তৈরী হ'য়ে নেবার ফুরসৎ দিলোনা পর্যন্ত, আচমকা নিয়ে এলো মহিম বাগচীকে। আশ্চর্য, ভাবতেও এখন কৌমুদীর সমস্ত শরীরে কাঁটা দেয়। কিন্তু সে সেই দারুণ অবস্থাটা একা একাই সাম্‌লে আস্‌তে পারলো, তার কাছে এখন যেন বিশ্বাসযোগ্যই মনে হচ্ছে না তা। একেই হয়ত লোকে মনের জোর বলে।

কি ভাবছো ভাই পুন্নিমেদি ! শিবানী কৌমুদীর বুকের ওপর হাত রাখলো।

আবার সেই ভাই সম্বোধন। কৌমুদী একটু হাসলো, ব'ললো, ভাবছি তোমার গণেশদার কথা। বেশ সুন্দর সুর ক'রে মহাভারত পড়ে।

শ্রীমতী পঞ্চশ্রী সমীপেষু

শুনেছ তুমি? সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলো শিবানী।

হুঁ!

কবে শুনলে?

এই যে তুমি বল্‌লে! কৌমুদী একটু রসিকতার সুরে বললো।

পুন্নিমেদিটা আচ্ছা ফাজিল তো! শিবানী কৌমুদীকে একটা চিমটি কাটলো।

পরিহাসপ্রিয়তা কৌমুদীর বেড়ে উঠ্‌লো, বললো, কবরেজি পড়ে তোমার গণেশদা, তাই না শিবানী? টিকি আছে?

ধেৎ! শিবানী কৌমুদীর গালেই বুঝি একটা চাপড় দিলো।

আচ্ছা শিবানী, গণেশদা তোমাকে বুঝি খুব ভালবাসে?

হুঁ।

তুমি বাসো?

কী জানি!

আচ্ছা, তোমার গণেশদা তোমাকে গল্প বলে?

উঁহুঁ!

আদর করে? কৌমুদী অনেকটা এগিয়ে এলো।

ইস্‌, আস্পদ্দা! শিবানী হঠাৎ ফোঁস ক'রে উঠলো: আদর মানে? আদর করলেই হ'লো? দিক্ তো গায়ে হাত, দেবোনা ঠাস্ ক'রে গালে এক চড় বসিয়ে!

কৌমুদী একটু থেমে বল্‌লো, রাগ্‌লে কেন শিবানী?

শিবানী ধীর গলায় বল্‌লো, রাগ আমার কিসের? ভালোবাসলেই সোহাগ করতে হবে? অমন সোহাগে কাজ নেই আমার!

ভালোবাসলে সোহাগ করবে না?

শিবানী এবার মর্মরমূর্তির মতন স্তব্ধভাব ধারণ করলো। কৌমুদীর

দিকে ফিরেও তাকালো না। কুলুঙ্গিতে প্রদীপটা দপ ক'রে জ্ব'লে উঠলো। কৌমুদী শুয়ে শুয়েই ব্যস্ত হ'য়ে বললো, এ হেঃ, বুকটা জ্বলে উঠেছে বুঝি, দাওনা ভাই নিবিয়ে।

শিবানী ত্রস্ত পায়ে উঠে গিয়ে হাত ঝাপটা দিয়ে বাতিটা নিবিয়ে দিলো। ঘরের মধ্যে এলো কালো পাথরের মতো ঠাণ্ডা অন্ধকার।

শিবানীর জীবনের গম্ভীর পয়ারের মধ্যে হঠাৎ খানিকটা লঘুত্রিপদী চালান্ ক'রে দিলো যেন কৌমুদী। কৌমুদী জেনেশুনে এ-কাজ করেনি অবশ্য। আ'ল দিয়ে যে শক্তিশালী স্রোতকে বাঁধা হ'য়েছে, এ যেন অযথা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে তার মধ্যে ঘা করা, সেই বাঁধকে দুর্বল করা। দেওয়ালে রাধাকৃষ্ণের ছবি, বাইরের হারিকেনের আলোতে ছবির নিচেটা কেবল দেখা যাচ্ছে: অর্ধশায়িত অবস্থায় ঊর্ধ্বদৃষ্টি রাধিকা কার যেন চোখের দিকে তাকিয়ে আছে: অন্ধকারের মধ্যে কৃষ্ণ ফেরার। এই মাত্র গণেশও মহাভারত বগলদাবা ক'রে অন্ধকার রাস্তায় হাততালি দিয়ে কাল্পনিক সাপ তাড়াতে তাড়াতে কবরেজবাড়ি চ'লে গেলো। অভিমন্যুকে সপ্তরথী দিয়ে ঘেরাও করিয়ে তবে গণেশের ছুটি হ'লো আজ। কেন, সে কি পাণ্ডবদের হৃতরাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে তারপর কবরেজবাড়ি যেতে পারতো না? ও-বাড়িতে এত শিগগির যাবার এত কিসের টান? কেবল অমৃতারিষ্ট আর চ্যবনপ্রাশ! কেবল খল আর গাছের মূল।

শিবানী।

উঁ।

গণেশদা চ'লে গেলো বুঝি?

শিবানী উত্তর দিলো না। একটু থেমে বললো, আবার কাল আসবে।

কৌমুদী ব'ললো, চমৎকার ছেলে কিন্তু গণেশদা। গলায় কী সুর! শুনতে হবে একদিন!

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

না শুনেই এত সুখ্যাতি! শিবানী একটু খোঁচা দিয়ে বললো: অত ঠাট্টা ভাল লাগেনা ভাই।

কৌমুদী বিব্রত হ'য়ে পড়লো, ব'ললো, মুস্কিল! ঠাট্টা কোথায় দেখলে? আমি প্রশংসা করলেই বুঝি ঠাট্টার মতো শোনায়? বেশ, আর না-হয় ওর কথা নাই-ই বললাম!

বলতে আবার মানা করেছে কে, শুনি!

তবে বলবো তো? শোনো, তুমি এক কাজ করো—তোমার বাবাকে বলে প্রকাণ্ড এক মাঠ নাও। আর অনেক টাকা চেয়ে নাও।

তারপর?

গণেশদাকে ডাকো। ডেকে, মস্ত একটা কবরেজি ওষুধের কারখানা বানাও। তোমরা ছু'টিতে মিলে গ্রামের সব গরিব রুগীদের চিকিৎসা লাগাও। ও হবে কবরেজ, তুমি হবে ধাই।

এয়ারকি মারছো বুঝি?

কৌমুদী একটু না হেসে পারলোনা। বললো, ফাজলামোর মত শোনালেও এ ফাজলামো নয়। তিস্তা থেকে আরম্ভ ক'রে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত এতটা জায়গার ভার যদি তোমরা নাও, তবে আর ভাবনা কী।

না থাক্ ভাবনা। ছাখো পুন্নিমেদি, তোমাকে একটা কথা বলে রাখি: আমাকে আর তাকে জড়িয়ে কোনো কথাই বলোনা। জানো তো, আমার বিয়ে হয়েছে, আমার স্বামী বেঁচে আছে। হতে পারে সে মদ খায়, সে মারে, সে অত্যাচার করে—তবু সে তো আমায় বিয়ে করেছে, আমি তো তার বৌ! গণেশদাকে নিয়ে এ-ভাবে যদি তোমরাই মস্করা করো, স্বামীর মনেই-বা বিষ কেন না ঢুকবে? তোমরাই যদি অবুঝ হও, স্বামীই বা তবে বুঝবে কেন?

পোদ্দারগিন্নী ঘরে ঢুকলেন: কি কথা হচ্ছে তোদের?

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

কৌমুদী উঠে বসলো, বললো, কিছু না, গল্প।

পোদ্দারগৃহিণীর নাকে প্রকাণ্ড একটি গোলাকার নথ, শরু চেন দিয়ে কানের সঙ্গে টানা দেওয়া। গা ময় গহনা। নথটা কিন্তু পোষাকী নয়, আটপৌরে। সর্বদার জন্যে নাকের সঙ্গে অতবড় একটা ঝামেলা ঝুলিয়ে চলাফেরা করতে দেখে অস্বস্তিতে কৌমুদীর দম আটকে আসে। তাছাড়া স্বামীপরিত্যক্তা বিধবা-বেশধারী স্বগর্ভজাত মেয়ের সামনে সোনায় সালঙ্কারা হ'য়ে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে দেখে কৌমুদীর অবহাওয়াটা ভালো লাগেনা। কিন্তু এ যে অহংকারের আতিশয্য নয়, এ যে নেহাৎ গ্রাম্য সরলতা—তার নমুনা মাঝে মাঝে সে পায় বটে, তবু এ সরলতা তার পছন্দসই লাগেনা। পোদ্দারগিন্নী পানের বাটার কাছে বস্‌লেন। চাকরটা কল্‌কেতে ফুঁ দিতে দিতে হারিকেন এগিয়ে দিয়ে গেল। দেওয়ালেই চোখ আছে কৌমুদীর। অন্ধকারে-ফেরার কৃষ্ণ হারিকেনের আলোতে ধরা প'ড়ে গেলো। দেখা গেল, অর্ধশায়িত রাধিকার চোখে চোখে তাকিয়ে সে হাস্‌ছে। হাসিটা ভারি দুষ্টু। কৌমুদী পলকের জন্যে বিজনের কথা ভেবে নিলো। মুহূর্তের মধ্যে একটা নিশ্বাসও ফেললো। পোদ্দারগৃহিণীর হাতের ধাক্কা লেগে হারিকেন একটু স'রে যেতেই ছবির কাচে প্রতি-ফলিত হ'য়ে আলো ছিট্‌কে বেরিয়ে আস্‌চে মনে হ'লো, সেই চক্‌চকে আলোতে রাধিকা হ'লো ফেরার। মনে হ'লো, কৃষ্ণ অযথাই হাসছে একা।

একা! এই সামান্য দু'টি অক্ষরের একটি কথা তার বুকের ভিতর দারুণ জোরে ঘণ্টার বাড়ি দিয়ে তাকে সোনামুখী গ্রামের ধান্যব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত অমুকচন্দ্র পোদ্দারের বিশাল এলাকার একটি প্রান্তের এই করগেটের চৌচালা ঘর থেকে কোন্ এক সুদূর করদরাজ্যের সুন্দর শহরতলীর আর একটি করগেটের চৌচালা ঘরে চালান্ ক'রে দিলো। যে-বাড়ীর সামে খানিকটা

নগ্ন মাঠ, আর রাস্তা থেকে যে মাঠটিতে তেরছাভাবে পায়েহাঁটা পথের শাদা দাগ প'ড়েছে।

কৌমুদী চুপচাপ শুয়ে। তার কানের মধ্যে সনাতনের খক্ খক্ কাশি ও বিজনের তানপুরা-হাতে গম্ভীর সুরালাপ যুগপৎ ধ্বনিত হচ্ছে।

পোদ্দারগৃহিণী ব'ললেন, গণেশ আজ বেশ পড়লো বটে! কাল পাণ্ডবদের রাজ্য-ফিরে-পাওয়া শোনাবে।

শিবানী নিশ্বাস ফেলতে গিয়ে হঠাৎ শব্দ ক'রে ফেললো।

কৌমুদী ব'ললো, বেশ ছেলে, তাই না?

তা বল্‌তে! শিবানীর বাপ তো গণেশ ব'লতে অজ্ঞান। বলে, এমন ছেলে জন্মেও ভাখেনি। যেমন জ্ঞান তেমনি বুদ্ধি, আর তেমনি নাকি চরিত্তির। এ গাঁয়ে আমাদের ওই কুমুদ-কবরেজের ভাত নাকি গণ্‌শাটাই মারবে। ছোঁড়াটার অবস্থা সুবিধের নয়, তাতে কি—পোদ্দারের টাকা আছে। মস্ত এক কবরেজখানা হ'লো ব'লে গাঁয়ে। কিন্তু গণ্‌শাটা যে আহাম্মক, মাগ্‌না খেটে মরতে ভারি আয়েশ ওর। ট্যাঁকে কড়ি গুঁজে রুগীর নাড়ি ধরবে—তা না! যে বলে আয়রে, তার সাথে যাইরে। রোগের বিচার নেই, বসন্ত হোক্ কলেরা হোক্—ডাক পড়তেই ছুট! রাত জেগে মরে—বিনিপয়সায়।

একটানা অখ্যাতি-সুখ্যাতি ক'রে পোদ্দারগৃহিণী পানের পিক ফেলতে উঠে গেলেন। ফিরে এসে ব'ললেন, যাই, এসেছে!

পোদ্দারমশাই অন্দরে ঢুকেছেন। নধর চেহারা বটে, তবে জৌলুষ নেই: মাটি মাটি রং গায়ের। নধর বটে, তবে বড্ড বেঢপ চেহারা! ভুঁড়ির থেকে বুক শরু, গোলগাল মুখের তুলনায় চোখ ছু'টি ছোট ছোট।

তিস্তামুখঘাট, নারাণগঞ্জ, চাঁদপুর, আর ব্রহ্মপুত্রের উজানে গৌহাটি ও ধুবড়া, এই কয় জায়গায় কয়েকখানা ধানবোঝাই নৌকা পাঠিয়ে তাঁর মন একটু

হাল্কা, আর ট্যাঁক একটু ভারি, তাই মেজাজটাও বেশ সরিফ। বাড়ী ঢুকেই ব'ললেন, গণেশ কই ?

গৃহিণী ব'ললেন, চ'লে গেছে !

এত শিগগির। শিবানী কই ? পূর্ণিমা ঘুমিয়েছে বুঝি ?

ব'লতে ব'লতে পোদ্দার শোবার ঘরে ঢুকলেন, প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে গৃহিণী তাঁর অনুগামিনী হ'লেন ! খাঁচার ময়নাটা কলরবে ঘুম থেকে জেগে অনুচ্চস্বরে দু'বার শব্দ করেই ক্ষান্ত হ'লো।

দিনের পর দিন কেটে গেলো। গণেশের যাতায়াত নিয়মিত চ'লেছে। তার আদর ও প্রভাব এ-বাড়ীতে বেড়ে চলেছে দিন দিন। পোদ্দারমশাই গণেশের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক ক'রে ফেলেছেন, এবারে পরীক্ষায় পাশ করলেই তার ডিস্‌পেন্সারী খোলা হবে। খানিকটা জায়গাও সেজন্যে ঠিক হয়ে গেলো। ঠিক নদীর ধারটায়। কয়েকটি হামনদিস্তা ও ওষুধের বোতল ইত্যাদি শহর থেকে আনবার ফরমাস পর্যন্ত হয়ে গেছে। গণেশ এখন যে বাড়ীতে থাকে ও আয়ুর্বেদ শেখে সে-বাড়ীও নদীর কিনারে। গণেশটা হয় ত কবি, সে চুপচাপ নদী ছাখে আর ঢেউ গোণে। কবরেজ-বাড়ির বারান্দায় বসে সে সময় নষ্ট করে থাকে মাঝে মাঝে, সময় নষ্ট করবারও তার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে অবশ্য। অদূরেই স্নানের ঘাট, সেখানে রোজ শিবানী ও কৌমুদী স্নানে আসে। ফেরার মুখে দু'চারটে বাক্য বিনিময় হয়ে থাকে, তবে সে তেমন মারাত্মক কিছু নয়।

কয়েকদিন থেকেই গণেশটা বড় গম্ভীর। মহাভারত পড়তে সে আজ কাল দেরী করে যাচ্ছে ও শিগ্‌গির করে ফিরে আসছে। এর কৈফিয়ৎ অবশ্য একটা আছে: তার পরীক্ষা হাতের কাছে এসে গেছে। কিন্তু শিবানী এ. কৈফিয়ৎ শুন্‌তে রাজি নয়। কৌমুদী শিবানীকে কারণটি জানার জন্যে বড় ব্যস্ত করে তুলেছে।

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

শিবানী ময়নাকে বলে, জানিস্ কিছু?

উত্তরে ময়না বলে, জানিস্ কিছু।

বিরক্ত হয়ে খাঁচায় একটা থাবা দিয়ে শিবানী বলে, ধেৎ!

কৌমুদী অভিনয়টা দেখে ফেলে, শিবানী লজ্জা পায়।

কয়েকদিন থেকে শিবানীও বড় গম্ভীর। আকাশে নতুন বর্ষা এসেছে, নদীর জল হয়েছে ঘোলাটে। কৌমুদীটা বড় বিপদে পড়লো। একটা সঙ্গী সে পেয়েছিলো, তার সঙ্গে কথা ব'লেও সময় কাটাতো, সেও কথা কম বলতে আরম্ভ করেছে। এতে কৌমুদীর লাভ হলো এই-যে বিজনটা তাকে পেয়ে বসলো। এত বিশ্রী লাগে বিজনের কথা ভাবতে, তবু রাতদিন তার কথাই তাকে ভাবতে হচ্ছে আজকাল। মনের অবস্থা মাঝে মাঝে এমন চঞ্চল হয়-যে তার ইচ্ছে করে, সে এখান থেকে একরাত্রে চুপচাপ রওনা হয়ে বিজনের কাছে চ'লে চায়!

সেদিন শিবানী এসে বললো, এবার চললুম পুন্নিমেদি।

কোথায়?

শিবানী নিরুত্তর।

কৌমুদীও কিছুক্ষণ চুপচাপ তার মুখের দিকে তাকালো। দেখলো, শিবানী মেঝের ওপর ফাঁকা দৃষ্টি দিয়ে ব'সে আছে। ব'ললো, কোথায় চললে?

শ্বশুরবাড়ী।

নিতে এসেছে বুঝি?

না।

তবে!

শিবানী কৌমুদীর দিকে তাকিয়ে বললো, গণেশদা যেতে বল্‌ছে।

হঠাৎ!

জানিনে। আমার নাকি যাওয়া উচিত। গণেশদা হয়ত ভালো কথাই বলেছে, আমার যাওয়াই উচিত। যে অবুঝ তাকে ছেড়ে চ'লে এসে তাকে বোঝাবো কী ক'রে? আমি যাবো। সত্যি ভাই, আমি যাব।

গণেশদা কি বললো?

কি আর বলবে? ভাল কথাই বললো। এতদিন তাকে ছেড়ে থেকে তাকে যথেষ্ট শাস্তি দেওয়া হ'য়েছে আমার, এবার যাওয়া দরকার। গণেশদার পরামর্শমত চললে আমার ভালই হবে পুন্নিমেদি। জানো তো, সে আমাকে ভালবাসে। কিসে আমার ভাল হবে সে কি জানেনা? কিন্তু—

কিন্তু কি?

গণেশদার হয়ত খুব কষ্ট হবে এখানে একা থাকতে। ও বড্ড খেয়ালী, শরীরের ওপর একটু যত্ন নেয় না, সে জন্যে কম ধমক খায় নাকি আমার কাছে?

খুব ধমকাও বুঝি?

শিবানী থেমে বললো, আমিও ভেবে দেখ্‌লাম যেতেই হবে, যদিও মন ঠিক সরছে না। বড় ভয় হ'চ্ছে, যদি খুব মারে!

কৌমুদী অপলক শিবানীর মুখের দিকে তাকালো, কথা বললো না। তার মনে একটি চিন্তা ঢুকেছে। গণেশের কথা অত সে ভাবছেনা, সে ভাবছে নিজের কথা। শিবানীটা একান্তই যদি চলে যায় তাহলে তারই বা এখানে থাকার সার্থকতা কী? সেও তাহলে একদিক বলে চলে যাক্। তারও যাবার জায়গার অভাব নেই। এক বছরের ওপর এই সোনামুখী গ্রামের সঙ্গে তার পরিচয়, এক মুহূর্তে সে এই পরিচয়ের কথা ভুলে যেতে পারবে। সনাতনের সঙ্গে থেকে থেকে তার মধ্যেও যাযাবর বৃত্তির বীজাণু সংক্রামিত হয়েছে, সেও স্থায়ীস্থিতি পছন্দ করেনা। আজকের আস্তানা কালকে ভেঙে ভেঙে তার মন মজবুত হ'য়েই আছে। যে-রাত্রে শিবনী রওনা হবে,

কৌমুদীও সেই রাত্রেই যাত্রা করবে। নিশানা হয়ত থাকবে গৌহাটী, কিন্তু স্রোতের টানে কতদূর যাবে তা অবশ্য সে জানেনা।

শিবানী সত্যিসত্যি তাহ'লে শ্বশুরবাড়ী চললো। গণেশ শিবানীকে চুপ করে নাকি ব'লে গেছে যে, কারুর ওপর মমতা যখন খুব বেড়ে ওঠে, তখন মানুষকে বিশ্বাস করতে নেই : বিশ্বাস ভঙ্গ হওয়ার আগেই মমতাভঙ্গ করা দরকার ; শিবানীকে শ্বশুরবাড়ী যেতে বলার এও নাকি একটা কারণ।

কথাটার মানে ঠিক-যে কী, শিবানী তা বুঝতে না পেরে কৌমুদীর শরণাপন্ন হ'লো। কিন্তু এর পরিষ্কার কোনো ব্যাখা করতে না পারায় শিবানীর কাছে কৌমুদী লজ্জা প্রকাশ করলো কেবল !

দু'জনে গল্প করতে করতে স্নান করতে চললো। তিস্তা আজ জলে থইথই। ঢেউ এসে পাড়ে আছাড় খাচ্ছে। ঘাটে লোক বেশি নয় আজ। হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তারা গল্প ক'রে চলেছে। কিছুদূরে একটি আধবুড়ো লোক একখণ্ড পাথরের ওপর কাপড়ে সাবান দিচ্ছে। একটি বুড়ি গলাজলে দাঁড়িয়ে সূর্যপ্রণাম করছে। শিবানীরাও গলাজলে নেমে এলো। পিছন ফিরে কবরেজবাড়ির বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লো, বারান্দা জনহীন। গণেশ তখন স্বাস্থ্যতীর্থ হবার চেষ্টায় মনোনিবেশ ক'রে পড়ছে ভেতরের ঘরে। এরা দু'জন নদীতে সাঁতারের চেষ্টা করছে তখন।

শিবানী বললো, গণেশদা দারুণ সাঁৎরাতে পারে।

এর বেশি বলার আর সুযোগ পেলোনা, কৌমুদীও শোনার ফুরসৎ পেলোনা। হঠাৎ তারা জলের টান অনুভব করলো। তার পর আচম্কা কী-যেন হ'য়ে গেলো।

যে-লোকটি সাবান কাচছিলো, হঠাৎ সে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠলো ও চীৎকার করলো, যে-বুড়িটা সূর্যপ্রণাম করছিলো তার ধ্যান ভাঙলো, তবে তার মুখ দিয়ে কথা বের হ'লোনা।

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

কবরেজবাড়ির বারান্দায় এমন সময় গণেশ গাঃ মোড়ামুড়ি দিয়ে পড়ার মাঝখানের বিরতিটা ভরাট করতে এসেছে। হঠাৎ সে স্তব্ধ হ'য়ে নদীর দিকে তাকিয়েই এক ছুট দিয়ে এসে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। মেয়ে দু'টো পাকে প'ড়েছে। পাক তাদের ঘুরাতে ঘুরাতে টেনে নিয়ে চ'লেছে, এইবার বুঝি তলিয়ে দেবে! গণেশ অশেষ শক্তি ধারণ করে। সাঁতারের কায়দাও জানে সে। দূরেকাছের মাঝিরা নৌকো নিয়ে এগিয়ে এসেছে। সাঁতারু গণেশ মেয়ে দু'টিকে উদ্ধার ক'রে মাঝির হাতে তুলে দিয়েই মুহূর্তের মধ্যে তলিয়ে গেলো! অন্যকে সে ত্রাণ করলো কিন্তু নিজেকে পরিত্রাণ করতে পারলো না।—এ ঠিক যীশুখ্রীস্টকে গাল-পাড়ার মত শোনালো, তাই না, পঞ্চমি? গণেশ কি করবে বলো! আবর্তের মুখের গ্রাস সে টেনে নিয়েছে, আবর্তের প্রতিহিংসা তাকে হজম করতেই হবে।

তারা দু'জন বিস্তর জল খেয়ে আধ-মরা হ'য়ে পড়েছিলো। মাঝিরা যখন নৌকো কিনারে লাগালো তখন গ্রামের অনেক লোক ঘাটে জুটে গেছে। ভবিষ্যতের বিখ্যাত কবিরাজ গণেশ সান্তারার এই আকস্মিক শোচনীয় পরিণতির জন্যে কেউ দুঃখ ও বিস্ময় প্রকাশ করতে বাকি রাখলোনা। মাঝিরা নানামুনির পরামর্শমত জাল নিয়ে নানাদিকে মৃতদেহের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। পোদ্দারমশাই, এমন-কি পোদ্দারগৃহিণীও, ঘাটে এসে উপস্থিত। এদের জীবন রক্ষা পাওয়ার জন্যে কোনো আনন্দোচ্ছ্বাসই হ'তে পেলোনা, শোকোচ্ছ্বাসেই সব চাপা প'ড়ে গেলো।

সোনামুখী গ্রামে এখন দুঃখের পালা চলেছে। এসো পঞ্চমি, আমরা এখান থেকে এখন পালাই। আদর্শ বন্ধু হ'তে আমরা চাইনে। দুঃখের সময় সোনামুখীর মুখে মুখ দিয়ে পড়ে না থাকলেও সোনামুখীর ওপর অবিচার করা হবেনা আমাদের। দুঃখটা বড় পাজি জিনিষ: মানুষের আসল রূপ

দেখিয়ে দেয়। পাছে আমাদের স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে, তাই আমরা সোনামুখী গ্রামের নাম গন্ধ এখন করবোনা।

ইচ্ছে করে, সশরীরে তোমার টাঙাইলে যাই: সেই বাব্‌লা-বন আর বসন্তবহুরীর চম্‌কে চম্‌কে ডাক পাড়া, সেই শাদা সিঁথির মতো পায়েহাঁটা রাস্তাটি ও সেই সর্বশ্রেষ্ঠ তুমি! স্বধু ইচ্ছেই করে, যাওয়া আর হয়না। দিনের পর দিন কেটে যায়: কৌমুদীর ইচ্ছেও পূর্ণ হয়না। সোনামুখী গ্রাম থেকে শিবানী যেদিন যাত্রা করলো, সেইদিন সন্ধ্যের পর থেকে কৌমুদী হ'লো নিখোঁজ। আশপাশের গ্রামে পোদ্দারমশাই লণ্ঠনহাতে লোক পাঠালেন, খবর পেলেন না। পোদ্দারগৃহিণীর মনেও নানারকমের কষ্ট, কৌমুদীর অন্তর্ধান কষ্টের আগুনে খানিকটা কাষ্ঠ যোগান দিল মাত্র। কিছুদিন খোঁজ খবর চললো তীব্রভাবে, তারপর ধীরে ধীরে তেজটা ক'মে এলো। ইতিমধ্যে শিবানীর নিজ হাতে গোটা-গোটা বাঁকা-বাঁকা ও অসমান অক্ষরের একটি চিঠি এসেছে কৌমুদীর নামে, সেটা দেয়ালের বাতার গায়ে গোঁজাই আছে, রোদ্দুর লেগে কাগজটার রং গেছে বদ্‌লে। আশ্চর্য, চিঠির মধ্যে শিবানী সোনামুখী গ্রামের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর জান্‌তে চেয়েছে, কিন্তু গণেশের নাম একেবারের জন্যেও উল্লেখ করেনি। গণেশকে এরি মধ্যে সে ভুলে গেলো নাকি?

পোদ্দার কিন্তু অনেক চেষ্টা ক'রেও গণেশকে ভুলতে পারলেন না। গণেশের মধ্যে তিনি বিশেষ গুণ এমন কী-যে পেয়েছিলেন জানিনে। তাছাড়া, এই দুর্ঘটনার পর মৃত গণেশের ওপর তাঁর টান আরো বেড়ে গেছে। গণেশের গুণ-গান করতে তিনি পঞ্চমুখ। তাঁর গভীর দুঃখ আরো প্রকাশ পেতো, যখন তিনি নিশ্বাস ফেলে জানাতেন-যে তার মৃতদেহটা খুঁজে পেলে তিনি কত সমারোহ ক'রে তার সৎকার করতেন। আর, তাঁর সেই বিরাট প্ল্যান্—সেই আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠান! পোদ্দার এই কথা বলতে গিয়ে

একেবারে গুম্ হ'য়ে বস্‌তেন। আঘাতের পর স্বধু আঘাত! শিবানীর শ্বশুরবাড়িতে লাঞ্ছনা, গণেশের আত্মোৎসর্গ, অবশেষে কৌমুদীর অতর্কিত অন্তর্ধান! স্নেহ আর মমতা, এই দু'টোর মতো মারাত্মক জিনিষ পৃথিবীতে আর নেই—পোদ্দার বলেন। গভীর রাত্রে পোদ্দার নাকি গণেশকে ঘুমের ঘোরে ডেকে ওঠেন, পোদ্দারগৃহিণী পাড়ার লোককে সকালে সুখবরটি দেন। পোদ্দারমশাই কিন্তু স্বীকার করেন না।

অনেকদিন কেটে গেছে, পঞ্চমি! সোনামুখী গ্রামে সহস্র সূর্যোদয় হ'য়েছে। এখনো কবরেজবাড়ির বারান্দা আগের মতোই নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে, এখনো অজস্র স্নানার্থী তিস্তানদীতে গলাজলে নেমে ডুব দেয়, কিন্তু কবরেজবাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে কেউ উৎসুক দু'টো চোখ নদীর জলের দিকে চালনা করেনা; কোনো স্নানার্থীও সতৃষ্ণ চোখে বারান্দার দিকে তাকিয়ে খ্যাখেনা।

আজ যদি তুমি তিস্তানদী দিয়ে নৌকো ক'রে সোনামুখী গ্রাম ঘেঁসে ভ্রমণে বের হও, তাহ'লে তার কিনারে একটা শাদা ছোট্ট মঠ দেখতে পাবে। মঠটা পোদ্দারমশাইএর কীর্তি ও গণেশের গৌরব। মঠের ঠিক মাঝখানে আবক্ষ গণেশের মূর্তি। মঠের গায়ে বড় বড় হরফে লেখা আছে:

৺গণেশচন্দ্র সান্তারা॥ জন্ম ভাদ্র ১৩১৮, মৃত্যু আষাঢ় ১৩৪৩॥
এই মহাপ্রাণ যুবক দুইজন বিপন্না রমণীকে নদী হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে॥ তাহার গুণমুগ্ধ বন্ধু শ্রীবিপিনচন্দ্র পোদ্দার কর্ত্তৃক এই স্মৃতিসৌধ স্থাপিত হইল॥

শাদা পাথরের ভেতর থেকে গণেশের শাদা দুইটি চোখ একদৃষ্টে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

শিবানী শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে আসে। নদীতে আস্‌তে সে ভোলেনা। জলে নামার আগে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে গণেশকে খ্যাখে—

অবিকল গণেশই যেন! সেই হাসি-হাসি মুখ, ঠোঁটের সেই নিখুঁৎ ভাঁজ, সবই ধরা প'ড়েছে। তারপর সে চান সেরে উঠে আসে। হাতের ঘটি থেকে জল ঢালে গণেশের বুকের কাছটায়! চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অস্ফুট গলায় বলে: গণেশদা, তুমি তো যেতে ব'ললে! কিন্তু ওরা আমাকে বড্ড মারে।

শিবানীর গলা কেঁপে যায়। কিন্তু গণেশ এখন পাথর, এ-কথার সে কোনো জবাব দেয় না।

শিবানী আস্তে আস্তে চ'লে যায়। কৌমুদীর কথা নিশ্চয় এখন তার মনে পড়ছে। এখন সঙ্গে কৌমুদী থাকলে সে কিছুটা সান্ত্বনা পেতো। কৌমুদী বোধ'য় কত সুখে দিন কাটাচ্ছে।

কিন্তু কৌমুদীর জীবনের ওপর দিয়ে ইতিমধ্যে কতবড় ঝড় ব'য়ে গেছে, শিবানী জানে না। আমরাও তা জানিনে, পঞ্চমি! আমরা তার খবর অনেকক্ষণ রাখিনি।

বহুদিন বাদে কৌমুদীকে আমরা আবিষ্কার করলাম এক হাসপাতালে— মাথায় শাদা পট্টি বাঁধা, পরণে এপ্রন্। রুগীর বুকে থার্মোমিটার দিয়ে সে ঘড়ির সেকেণ্ড গুন্‌ছে! সে-কৌমুদীর ও এ-কৌমুদীর মধ্যে পার্থক্য বিস্তর!

আজ তিন বছর আগে যে ট্রেনে সে সোনামুখী গ্রাম থেকে পালায়, সেই ট্রেনেই এক বিদেশী নার্সের সঙ্গে তার ভাব হয়। কৌমুদীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর তিনি বুঝতে পারলেন, এই ধরণের মেয়েই এ-কাজের যোগ্য। তাই তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে টানা চলে এলেন কলকাতায়। কলকাতায় পৌঁছে কৌমুদী পালাবার চেষ্টা ক'রেছিলো, কারণ বিজনের খবর না নিয়েই সে আটক হ'তে রাজি নয়। যদিও রোগিসেবাব্রত দস্তুরমত তার পছন্দসই। বছরখানেক হাসপাতালে কাজ শেখার পর সে অসুখের ভান করলো ও চেঞ্জএ যেতে চাইলো। ছুটি

মঞ্জুর হ'লে সে সটান চ'লে এলো গৌহাটি। বুকে সাহস সঞ্চয় ক'রে সে বিজনদের বাড়ি পর্যন্ত পৌছে মাথায় হাত দিলো। বাড়িটা তালাবন্ধ। কৌমুদী গৌহাটিতে চেঞ্জে এসেছে, তারাও চেঞ্জে গেছে চেরাপুঞ্জিতে। আর এদের ছেলে বিজনকুমার এখন আছে রুড়কিতে। কৌমুদী গৌহাটি থেকেই বিজনের কাছে সংক্ষিপ্ত এক চিঠি দিলো, তার জবাবের প্রতীক্ষায় ব'সে রইলো গৌহাটির হোটেলে। সেখানে তার সাক্ষাৎ হ'লো এক শিকারীর সঙ্গে। ভদ্রলোক কাঁধে ক্যামেরা আর বন্দুক ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ান। চল্লিশের ওপর বয়েস হবে, কিন্তু চাঞ্চল্য চোদ্দের। কৌমুদীই এখন হ'লো তাঁর বিগ্-গেম।

রুড়কি থেকে বিজন লম্বা-এক চিঠি পাঠালো। এতদিন বাদে—বছর আড়াই নিশ্চয়ি—এমন অপ্রত্যাশিত চিঠিতে সে আশ্চর্য হ'য়ে :গেছে। এতটা দিন এমন আত্মগোপন ক'রে থাকার নাকি কোনো কারণই বিজন ভেবে পাচ্ছে না। গৌহাটিতে এসেও কৌমুদীকে হোটেলের আতিথ্য নিতে হ'লো, এর চেয়ে দুঃখের ও বিস্ময়ের কথা আর নাকি কিছু হ'তে পারে না। বিজন নাকি কৌমুদীর খোঁজ ক'রেছে বিস্তর—কিন্তু কোনো খবর না পেয়ে সে প্রায় জেনেই রেখেছিল-যে কৌমুদী আর নেই। কৌমুদীর মতো ভাবপ্রবণ মেয়ে তো বিজন আর দেখেনি! যাই হোক্, সে আস্‌চে। আজ কাল পরশু—এই তিনটে দিন বাদ দিয়ে। এই তিন দিন নড়ার উপায় নেই। কেন? তা মুখেই বলবে সে। আর শেষে একটা অনুরোধ বিজন ক'রেছে, ইতিমধ্যে তার বাবা-মা যদি চেরাপুঞ্জি থেকে ফিরে থাকেন তাহ'লে কৌমুদী-যেন হোটেল ত্যাগ ক'রে বাসায় চ'লে যায়। এতে সংকোচের কিছু নেই, ভয়েরও কিছু নেই নাকি! বিজন নাকি কৌমুদী সম্বন্ধে সব কথাই খুলে ব'লেছে এবং কৌমুদীর ওপর এখন তাঁদের সহানুভূতি জন্মেছে।

চিঠি পড়া শেষ ক'রে কৌমুদী বারান্দায় বেরিয়ে এলো।

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

শিকারী ভদ্রলোকটি ব'ললেন, With your permission, may I take a snap ?

কৌমুদী ব'ললো, তার মানে ?

মানে ? শিকারী ভদ্রলোকটি ব'ললেন, আপনার অনুমতি চাচ্ছি, আপনার একটা ছবি তুলবো।

কৌমুদী ব'ললো, ইংরিজির মানে জান্‌তে চাইনে, অনুরোধের মানে কি ?

ভদ্রলোকটি হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন : অনুরোধের আবার মানে থাকে নাকি ?

কৌমুদী ঘরে চ'লে গেলো।

কতদিন্ পরে বিজনের সঙ্গে এবার তার দেখা হবে। কৌমুদী চিঠিটা আর-একবার খুললো। বিজনের হাতের লেখাটা কিন্তু কিছুতেই ভালো হ'লোনা। অথচ, লেখার ধরণটা ভারি মিষ্টি : ইন্‌জিনিয়ারের ভাষা একেবারে সাহিত্যিকের মতো !

শিকারী ভদ্রলোকটি দরজার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন আবার। ব'ল্‌লেন, With your permission, may I come in ?

তার মানে ? কৌমুদী সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালো।

একটু আলাপ করবো।

আসুন ! বসুন ! করুন্ আলাপ !

শিকারী ভদ্রলোকটি চমকালেন। বিস্মিত চোখে তাকালেন কৌমুদীর দিকে : আপনার গলার স্বর বড় রুক্ষ কিন্তু !

কৌমুদী পাল্টা জবাব দিলো : আপনার আচরণ ভদ্রোচিত নয় কিন্তু !

কেন ? কিছু অভদ্রতা ক'রেছি ?

তা না করলেও, ভদ্রতাও কিছু করেননি !

মাপ করবেন। শিকারী ভদ্রলোক রীতিমতো হাত জোড় ক'রলেন: উঠ্‌লাম তাহ'লে।

কৌমুদী আর কোনো কথা বললোনা।

ভদ্রলোকটি উৎসুক চোখে কৌমুদীর সর্বাঙ্গে নজর দিতে' দিতে বেরিয়ে গেলেন: কী-যেন অদ্ভুত-এক আকর্ষণ তিনি লক্ষ্য ক'রেছেন চেহারায়।

রাত্রে শোবার সময় একদিকের দরজার ছিট্‌কিনি নেই দেখা গেলো। কৌমুদী ম্যানেজারকে ডেকে পাঠাতে তিনি সশরীরে এসে উপস্থিত হ'লেন, কিন্তু দরজা খোলা থাকলে ভয়ের কারণ নেই—এই ভরসা দিয়ে নেমে গেলেন।

রাত্রে কৌমুদীর হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো, ভয়ার্ত চীৎকার ক'রে ব'ললো, কে?

মশারীর বাইরে একটি মানুষের ছায়া স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কৌমুদী উঠে ব'স্‌লো, আবার ব'ললো, কে ওখানে?

ভয় নেই। ছায়ার গলা দিয়ে স্বর বের হ'লো।

তার মানে? কৌমুদী মশারী সরিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

ছায়াটি বিনীত গলায় বললো, With your permission,—

ওঃ, আপনি? শিগ্‌গির বেরিয়ে যান্। যাবেন না? কৌমুদী চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো: ম্যানেজার, ম্যানেজার!

ম্যানেজারকে ডেকে কোনো ফল হবেনা। ছায়াটি পথ রুখে দাঁড়ালো: সব দরজা বন্ধ। তুমি এখন আমার হাতের মুঠোয়, তা জানো? ম্যানেজার আমার হাতের লোক! তাঁকে ডেকে লাভ নেই।

কৌমুদী নিরেট হ'য়ে দাঁড়ালো। বালিশের তলা থেকে চকিতে কি-যেন টেনে বের করলো।

শিকারী ভদ্রলোক এবার শারীরিক বল-প্রয়োগের জন্যে তৈরী হ'লেন।

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

কৌমুদী কোনোদিকে না তাকিয়ে কি-যে করলো তা জানেনা। শিকারী ভদ্রলোক একটা বিকট শব্দ ক'রে উঠ্‌লেন। কৌমুদী দরজা খুলে দ্রুত বেগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

কয়েকটি মুহূর্তের ঘটনা মাত্র। কৌমুদীর সমস্ত শরীরে কাঁটা দিচ্ছে। রাস্তার আলোয় সে ভুজালীটা মেলে ধরতেই ছাখে, রক্ত। তার শিরার রক্তস্রোত হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে গেলো যেন। সে-যে কী করবে কিছুই বুঝতে পারলোনা। রাত্রের গৌহাটি। অদূরে ব্রহ্মপুত্রের ছলছল শব্দ। ব্রহ্মপুত্রের মধ্যেই সে লাফ দিয়ে পড়বে নাকি? আজ বিজনদা এখানে থাকলে এই বিপদ তার কখনোই হ'তোনা। কৌমুদী নদীর রাস্তা ধরেই চললো। সনাতনও যদি আজ বেঁচে থাকতো! ভাবতে না ভাবতেই, একি! সম্মুখে সশরীরে সনাতন। সনতন বললো, আয়।

কৌমুদী তার পিছন পিছন চললো। শহরের পাকা রাস্তা পেরিয়ে কৌমুদী সনাতনের সঙ্গে কাঁচা রাস্তা ধরে চ'লেছে। রাস্তা হাঁটতে তার এতটুকু পরিশ্রম হ'চ্ছেনা। গাছে গাছে বাদুড় পাখা ঝাপটাচ্ছে। শুকনো পাতায় সর-সর শব্দ হ'চ্ছে। নির্ভীক কৌমুদী হেঁটে চ'লেছে। আজ তার আবার ভয় কিসের, সনাতন আজ তার সহায়। তারা একটা নৌকোয় উঠ্‌লো। নৌকোটা দেখ্‌তে বড় অদ্ভুত: ঠিক-যেন একটা বোয়ালমাছের আকৃতি। কী বেগ সে নৌকোর! তীরবেগে নৌকো ছুটে চ'লেছে, কৌমুদী সনাতনকে কি-যেন জিজ্ঞাসা করতে গেলো। সনাতন ইসারা ক'রে তাকে চুপ করতে ব'ললো। জলের দিকে চোখ রেখে কৌমুদী ব'সে ছিলো, হঠাৎ তার মনে পড়লো, সে ছোট্ট ভুজালী দিয়ে দাঁড় টান্‌তে লাগ্‌লো। ভুজালীর রক্ত তবু হয়ত ধুয়ে গেলোনা। কৌমুদী ভালো ক'রে ধুয়ে নিয়ে মাথা তুলেই ছাখে, সকাল। পাখীর ডাকে তার ঘুম ভেঙে গেলো ব'লে তার মনে হয়। এ আবার কোন্ জায়গা? একটা আশ্রম ব'লে মনে হ'চ্ছে এটাকে।

কিন্তু সনাতন গেলো কোথায়? তার ভুজালী, আর সেই নৌকোটা, অবিকল বোয়ালমাছের মতো যার আকৃতি!

আপনি কোত্থেকে আস্‌চেন? একজন মাঝবয়সী মেয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো।

কৌমুদী বিনীত ভাবে ব'ললো, কোত্থেকে এসেছি তা জেনে লাভ নেই, কোথায় এসেছি সেই কথা আমাকে বলুন!

এটা একটা আশ্রম: নাম সত্যাশ্রম। এ-জায়গার নাম আগে ছিল যৌবন, এখন নাম হ'য়েছে সত্যপীঠ।

আপনাদের গুরুদেব কোথায়?

প্রভু? প্রভু আছেন। মেয়েটি চোখ স্তিমিত ক'রে ব'ললো: আসুন আপনি!

তাঁর সঙ্গে দেখা হবে?

অবশ্যই। চোখ টেনে-টেনে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে মেয়েটি জবাব দিলো।

গুজব, এখানকার সাধুবাবা অলৌকিক শক্তি ধারণ করেন। শক্তির উপাসক ইনি, নিজেও শক্তিধর। এঁর শক্তি-সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনতে পাওয়া যায়। ভক্তরা গুরুদেবের গুণকীর্তন ক'রে বেড়াবার ভার নিয়েছে। প্রধান ভক্তের নাম রাখাল। তিনি সপরিবারে মঠে থাকেন। সহধর্মিনী ইন্দুমতী রাখালের অভিভাবিকা, অর্থাৎ তাঁর তাঁবে রাখাল থাকতে বাধ্য। ইনি সাষ্টাঙ্গে গুরুদেবকে প্রণাম ক'রে বলেন, বাবা, আর কতদূর॥ অর্থাৎ স্বর্গ আর কত দূরে। সাধুবাবা বলেন, এসে গেছিস্ বেটি॥ সাধুবাবার মুখের কথা, এ তো মিথ্যে হবার নয়। সত্যের পূজারী ইনি। ক্ষমতা এঁর অনেক, অন্তর্দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। কবে কে নাকি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে সংকল্প ক'রে পকেটে বিষ নিয়ে সাধুবাবাকে শেষ প্রণাম করতে এসে ধরা প'ড়ে যায়। বেচারার মরা আজো হয়নি। সাধুবাবা নাকি তাকে শাসন ক'রে বলেন, ফেলে দিয়ে আয়, পকেটে যা আছে ফেলে দিয়ে আয় শিগ্‌গির॥

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

আশ্চর্য, লোকটা হক্‌চকিয়ে গেলো। অনুগত শিশুর মতো সে পকেট থেকে বিষ ফেলে সাধুর পায়ে উপুড় হ'য়ে পড়লো, কাঁদ-কাঁদ হ'য়ে বললো, পতিতের মনের কথা কী ক'রে জানলে বাবা॥ এ-কথার উত্তরে বাবা তাকে রুক্ষ স্বরে আশীর্বাদ করলেন, যার জন্মে মরতে চাস্, তা তুই পাবি॥ লোকটা নাকি এক মাসের মধ্যে চাকরি পেয়েছিলো। রটনা এই রকম অনেক আছে, তবে সাধুবাবার আদেশে লোকের নাম-ঠিকানা বলা হয়না। কেবল লোকটা ব'লেই পরিচয় দেওয়া এ-আশ্রমের রীতি। একদিন তিনি স-ভক্ত মোটারে আস্‌চেন, মোটারের হেড্‌লাইট জ্বলছেনা, পথে পুলিশ পাকড়াবে এই ভয়ে ভক্তরা বললো, এখন উপায়॥ সাধুবাবা নাকি ব'ললেন, চলো॥ প্রকাণ্ড শহর, মোড়ে মোড়ে পুলিশ। কী-এক শক্তি প্রয়োগ করলেন সাধুবাবা, একটা পুলিশও মোটারের দিকে তাকালোনা পর্যন্ত। পশ্চিমের কোন্ এক নামকরা জায়গায় সারা ভারতবর্ষের ভক্তরা মিলিত হ'য়েছে, ভোজ হ'বে। এক কানাকড়ি হাতে নেই, কাপ্তেন ভক্তরা চাঁদা তখনো পাঠায়নি। মধ্যবিত্ত ভক্তরা বললো, এখন উপায়॥ সাধুবাবা ব'ললেন, হ'য়ে যাবে॥ আশ্চর্য ব্যাপার, সত্যি সত্যি হ'য়ে গেলো। সে কী ভোজ! সবাই প্রাণ ভ'রে খেয়ে খাবার ফুরাতে পারলোনা। এমনি এই সাধুবাবার অসাধারণ শক্তি। কোন্‌খান দিয়ে তিনি কী করেন বোঝা শক্ত। লোকের মুখ দেখে তিনি তার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর বলেন।

গল্প শুনে কৌমুদী প্রায় আধখানা হ'য়ে গেলো। সাধুবাবার সঙ্গে দেখা করার সখ তার গেল উপে। বিজন থেকে আরম্ভ ক'রে শিকারী ভদ্রলোক পর্যন্ত সব খবরই তো তিনি তা'হলে রাখেন। কৌমুদীর ভয় করতে লাগলো। তবু যেতে হবে। একবার যখন যাবার কথা ব'লেছে, না গেলে সাধুবাবা রুষ্ট হবেন: তিনি যে সর্বজ্ঞ। কৌমুদী ভয়ে ভয়ে চল্লো।

রাখাল আর ইন্দুমতী এই দিকেই আসছিলো। ব'ললো, বাবা এখন ধ্যানস্থ। নতুন কেউ এলেই তিনি ধ্যান-ধারণ করেন, কিসে তার ভাল হবে তারি উপায় বা'র করার জন্যে।

কৌমুদী ব'ললো, বাবা ধ্যানস্থ? না গেলাম তা হ'লে?

সে কি? ইন্দুমতী শিউরে উঠ্‌লো।

রাখাল সংক্ষেপে ব'ললো, কাণ্ড!

সাধুবাবার সমুখে কৌমুদী করজোড়ে দাঁড়ালো। সকলে তাকে ইসারা করে চরণ-ধারণ করতে বলায় সে পায়ের ওপর উপুড় হ'য়ে পড়তেই বাবার দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। তাকিয়ে বললেন, আহা।

ভয়ে কৌমুদীর গলা শুকিয়ে উঠ্‌লো, বললো, অপরাধ ক্ষমা করুন।

কেন অন্যায় করলি? সাধুবাবা ক্রোধে অন্ধ হয়ে বললেন।

কোনো অন্যায় তো করিনি আমি। কৌমুদী সংশয়ে পাথর হ'য়ে বললো।

করিস্ নি?, মিথ্যা। আশ্রমের কলঙ্ক। সত্যাশ্রমের দুর্নাম করতে চাস্? বল্, কি অন্যায় ক'রেছিস্?

কৌমুদী মাথা নিচু ক'রে ব'সে রইলো: সনাতন তাকে কোথায় ফেলে চলে গেলো!

সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন সাধুবাবা, ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, কেন পালালি?

কৌমুদী তাঁর মুখের দিকে অপরাধীর মত তাকালো। কিছু বলতে পারলো না।

পর-পুরুষ না সে? সাধুবাবা বললেন, তুই-না হিন্দুর মেয়ে! তার সঙ্গে পালালি? স্বামীর নিষেধ মানলি না। কোলের ছেলের ওপর এতটুকু মমতা রাখলিনা তুই? তাকে ফেলে চ'লে এলি? ওই শোন্, কান পেতে শোন, সে ডাকছে, মা মা মা!

সে কি কথা? ইস্। কৌমুদী এর কী প্রতিবাদ করবে? বিরাট সভার সকলে স্তব্ধ। সকলে শ্যেনদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে। মাটির সঙ্গে কৌমুদী মিশে যেতে লাগলো। এই কি এঁর অলৌকিক সত্য? এর চেয়ে লৌকিক মিথ্যা শত-গুণে ভালো যে! কৌমুদীর ইচ্ছে হ'লো, সে তার শরীরের পূর্ণদীর্ঘতায় দাঁড়িয়ে সহজ সপ্রতিভ গলায় এই কথার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপীল করে।

সাধুবাবা বললেন, এক-শ আট সন্ধ্যা তোকে আশ্রয় প্রদক্ষিণ করতে হবে। তবে, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে তোর।

ইন্দুমতী ফিক্ ক'রে হেসে ফেললো।

পুরুষ ভক্তেরা কৌমুদীর দিকে সতৃষ্ণ তাকিয়ে নিশ্বাস পাত করলো।

রাখালের গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো, তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সাধুবাবাকে ধ'রে বসালো সে। ব'ললো, বাবা, অনুতাপ ওর এসেছে। আপনি ক্রোধ নিবারণ করুন্!

সাধুবাবা গদ-গদ গলায় ব'লে উঠ্লেন: আমার ইন্দুমতী, ইন্দুমতী মা আমার! আমার সতী মা, সাধ্বী জননী! এদিকে আয়, এদিকে আয়!

অ্যাঁ, একি? জ্ঞান হারালেন সাধুবাবা? আশ্রমের এ-আঘাত সইতে পারলেন না। সত্যাশ্রমে তাঁর কালনাগিনী ঢুকেছে! আশ্রমের পবিত্রতা আজ নষ্ট হয়ে গেল যে! এ-আঘাত সহ্য করা সাধুবাবার পক্ষে সম্ভব নয়।

নিবারণ ইন্দুমতীকে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে উঠ্লো, ইন্দুভাই এ কি হ'লো?

ইন্দু তাকে চাপাগলায় শাসন করলো: ফাজিল।

এত কাণ্ড দেখে কৌমুদী পাথর হ'য়ে গেছে। চাক্ষুষ এ-দৃশ্য না দেখ্লে দৃশ্যের সম্পূর্ণ করুণতা আন্দাজ করা সহজ নয়, পঞ্চমি! কৌমুদী আচম্‌কা চাক্ষুষ এই দৃশ্য দেখে মাছের মতো বোবা হয়ে গেছে। বিজনের

খোঁজে এসে সে আশ্রমে আটকা প'ড়ে গেলো! এখান থেকে গৌহাটি যাবার রাস্তাই সে চেনে না, তা না হ'লে ফিরে যেতো নিশ্চয়ি। রাস্তা চেনার দরকার নেই, সে এমনিই পালাবে।

কিন্তু পালানো তার হ'লোনা, পঞ্চমি। আশ্রমকে কেন্দ্র ক'রে চারদিকে কাঁচা বসতবাটি। তার একদিকে থাকে মেয়েরা, অন্য দিকে পুরুষ। মেয়ে-মহলে তার থাকার একটা ঘর ঠিক হ'য়ে গেলো। পুরুষের সংখ্যা সবসুদ্ধ বাইশ, মেয়ের সংখ্যা এক-শ তেষট্টি—কৌমুদীকে বাদ দিয়ে। গ্রামের মাঝে একটা ছোট্ট শহর তৈরী হ'য়ে গেছে এখানে। শনিবার রাত্রটা এখানে খুব উৎসবে কাটে। সন্নিহিত শহর থেকে কাপ্তেন ভক্তরা সেদিন সাধুসঙ্গ করতে আসেন। এই উৎসবের দিনটা কৌমুদী কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেনা। এদিনে সারারাত ধ'রে কীর্তন গান হয়, ভগবানকে ডেকে ডেকে ভোরের দিকে সবার গলা ধ'রে আসে, তখন সকলে বেসুরে গান করে: উর্বশী, তুমি স্বর্গ-বেশ্যা॥ জনৈকা উর্বশী এতে চ'টে যান্, সুরসভার কবিকে সস্নেহ ভর্ৎসনা ক'রে বলেন: দেবশিশু, তুমি লম্পট-চূড়ামণি॥ গলার স্বরটা যেন চেনাচেনা! রাখাল এখন সাধুবাবার কাছে!

সাধুবাবার কদর দিন দিন বেড়ে উঠ্ছে। তাঁর সাধুত্বের প্রমাণ ও সন্ন্যাসের সার্থকতা এই-যে তাঁর ভক্তের সংখ্যার মধ্যে তিনজন ডেপুটি, একজন আই-সি-এস, জন পাঁচেক রায়বাহাদুর ও পঁচাত্তর জন কয়লাব্যবসায়ী, বাকী সকলে কেরানী কিংবা বেকার। অধস্তন ভক্তেরা এ নিয়ে বড় গর্ব ক'রে থাকেন। সাধুবাবার নাম প্রচারের সময় সগৌরবে তাঁরা রায়বাহাদুর ও ডেপুটি প্রমুখ ভক্তদের নাম করেন সর্বাগ্রে; এবং কয়লাব্যবসায়ীদের বার্ষিক আয় কত, সেই পরিমাণ দেখিয়ে সাধুবাবার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। ভক্তদের কর্তব্যের ত্রুটি বা'র করা কঠিন।

কৌমুদীর ঊনত্রিশবার আশ্রম প্রদক্ষিণ শেষ হ'য়েছে: এখনো ঊনআশি

সন্ধ্যা প্রদক্ষিণ করা বাকি। আশ্রম প্রদক্ষিণ করা মানে এক মাইল পথ নীরস হাঁটা। এ-হাঁটায় কোনো উৎসাহ নেই, আগ্রহ নেই। কোন্ পাপে তার এ-শাস্তি, কৌমুদী বুঝেছে। সে মনে মনে বলে, এই আশ্রমে ঢোকার শাস্তি এটা। এক-একটা দিন যেতে যেন পুরো একটি ক'রে বছর লাগছে। বিজন রুড়কি থেকে এসে নিশ্চয় বিপদে প'ড়েছে। শিকারী ভদ্রলোকটি নিশ্চয় ম'রে গেছেন, তাকে হত্যা করার শাস্তি হয়ত ভোগ করছে বিজন। গৌহাটিতে পৌঁছে বিজন নিশ্চয় হোটেলে তার খোঁজ করতে গিয়ে ধরা প'ড়ে গেছে, আসল আসামী তো এখন ফেরার। অযথা বিজন শাস্তি পাচ্ছে, তাই হয়ত কৌমুদীর ভাগ্যেও এই হেতুহীন শাস্তি এসে প'ড়েছে। বিজনের জন্যে কৌমুদীর বড় চিন্তা হ'চ্ছে।

তোমার নাকি শরীর খারাপ : তোমার জন্যেও আমার বড় চিন্তা হ'চ্ছে, পঞ্চমি। আমি এই লম্বা চিঠিটা লিখতে আরম্ভ করার পর থেকে তোমার চারখানা চিঠি পেলাম। তার একটারও উত্তর দিইনি, ইচ্ছে ক'রেই দিইনি। আমার এ-চিঠি লেখা শেষ না হ'লে আমি তোমার অন্য চিঠির উত্তর দেব না। আমার জন্যেও তুমি নাকি বিষম ব্যস্ত। ব্যস্ততার কিছু নেই, আমি ভালোই আছি, কেবল চোখের যন্ত্রণা ও তার অনুষঙ্গী মাথা ধরা রোগটা মাঝে মাঝে আমাকে কাবু ক'রে ফেলছে—যার জন্যে এই চিঠি লেখায় বাধা পড়ছে অনেক, না হ'লে এতদিনে কৌমুদীর জীবনবৃত্তান্ত লেখা, তথা, এই চিঠি লেখা শেষ হ'য়ে যেতো। কিন্তু তোমার রোগটা কী বলো তো! মাঝে মাঝে শরীর এত খারাপ হ'চ্ছে কেন? ওটা মনের রোগ : মনকে চাঙ্গা করো, মনে জোর আনার চেষ্টা করো। দেখ্‌বে, শরীরেও কোনো রোগ নেই। আমার রোগ হ'চ্ছে চোখের পরিশ্রমজনিত। পরিশ্রম থেকে বিশ্রাম নিলে পঙ্গু হ'য়ে যাবো। এটা নযযৌ-নতস্থৌ অবস্থা আর কি! আশ্চর্য! এক্ষুনি তোমার আর একটা চিঠি এলো। লিখেছ, চিঠির

উত্তর না দিলে তুমি রক্ষে রাখবে না। আমি কিন্তু চরমতম শাস্তির জন্যে প্রস্তুত। জানি, এ-চিঠি লেখা শেষ হবার আগে তোমার আরো চিঠি আসবে—যদি-না অভিমান ক'রে চিঠি লেখা বন্ধ করো। কিন্তু উত্তর আমি কিছুতেই দেব না। এটা আমার জেদ্। তুমি জানো, আমার জেদ্ বড্ড বেশী। সত্যের পূজারী আমি নই, সত্যসঙ্ঘের সভ্যও নই: তবে মুখ দিয়ে একবার যা প্রকাশ করি, তা পালন করিই। সাধু হ'তে চাইনে, তবে অসাধু যেন না-হই, এই আমার চেষ্টা।

এদিকে কৌমুদী যখন প্রথম সাধুবাবার সম্মুখে উপস্থিত হ'লো, সেই সময় গৌহাটিতে বিজনের পদার্পণ। হোটেলের ম্যানেজারের কাছে গিয়ে সে খবর নিলো। হোটেলওয়ালা বিজনের নাম ঠিকানা আগে লিখে নিলেন, তার পর বললেন, মেয়েটি গত সন্ধ্যায় হোটেল ছেড়ে চলে গেছে। মেয়েটি তার মালপত্তর নিয়ে যায় নি, তা আর বললেন না। বিজন কিছুই বুঝতে পারলো না। এমন আচমকা হোটেল ছাড়বার হেতু কি, সে ভেবে পেলো না। গেলো কোথায়? ম্যানেজার নাকি অত খবর রাখেন না। কেন গেলো, কোথায় গেলো—অত খবর রাখার সময় নাকি তাঁর নেই! একটা মেয়ে এসেছিলো, চ'লে গেছে—এইটুকু মাত্র তিনি জানেন, ব্যস্! ম্যানেজারের মেজাজটা সুবিধের নয়। বিজন চ'লে গেলো—সেই রুড়কি থেকে এই গৌহাটি—এতটা রাস্তা সে এলো কি অযথা? কৌমুদী কেন এলো, চলেই বা গেলো কেন? অদ্ভুত! বিজনের নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করলো। চেরাপুঞ্জি থেকে তার বাড়ির কেউ ফেরে নি। সেই রাত্রেই বিজন চেরাপুঞ্জি যাত্রা করলো। বলা যায় না, কৌমুদী সেখানেও যেতে পারে। তার তো খেয়াল!

কৌমুদীর খেয়ালই বটে! অন্ধকার ঘরে বেপরোয়া ভুজালী চালিয়ে শিকারী ভদ্রলোকটির অবস্থা সে সঙ্গীন ক'রে তুলেছে—এও তো খেয়ালের

জন্যেই। একেও খেয়াল বলে বই কি! শিবানীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করলো, খেয়ালেরই বশে। সোনামুখী গ্রাম ছেড়ে ধাত্রী হ'লো, ছুটি নিয়ে এলো বিজনের সঙ্গে দেখা করতে, তারপর সত্যপীঠে পড়লো আটকা—এও খেয়াল। কৌমুদীর খেয়ালই এম্‌নি! একটা খেয়ালের ওপরই তার জন্ম, আর খেয়ালী সনাতনই তার প্রতিপালক। নীলরতনবাবু এই জায়গায় বড় করুণ সুরে গল্পটা বল্‌তেন। আমার লেখা পড়ার থেকে তাঁর মুখে শুন্‌লে তুমি কৌমুদীর অবস্থা আরো ভালো ক'রে বুঝতে পারতে। বুড়োর বলার ধরণ ভারি সুন্দর।

কিন্তু খেয়াল তো কৌমুদীর নয়: খেয়াল ম্যানেজারের, খেয়াল শিকারী ভদ্রলোকের। তাঁরা দু'জন বদ-খেয়ালের ঝোঁকে যুক্তি ক'রে একটা কাণ্ড করতে গিয়ে কাণ্ড বাধিয়ে বস্‌লেন। ভদ্রলোকটি হ'লেন জখম আর ম্যানেজার পড়লেন ফাঁপরে। ম্যানেজার ছিলেন দিব্যি আরামে ঘুমিয়ে, ঘুম ভাঙার পর টের পেলেন তাঁর হোটেলের রঙ্গমঞ্চে একটা নাটক অভিনীত হ'য়ে গেছে। নাটকের সঙ্গে ফাটকের চমৎকার মিলের ভয়ে, তিনি একটা প্লট খাড়া করলেন। অবশ্য প্লটটা আহত শিকারীর সঙ্গে যুক্তি ক'রেই খাড়া করা হ'লো। এ-প্লট থেকে কৌমুদী একেবারে বাদ। কারণ, ভুক্তভোগীরা বলেন, মেয়ে-সংক্রান্ত বিষয়ে বিপদ অনেক। ম্যানেজার ঘোষণা করলেন, তাঁর হোটেলে গত রাত্রে ছোটখাট ডাকাতি হ'য়ে গেছে। শহরে খানাতল্লাসী চললো। কেউ ধরা পড়লো না। কারণ ডাকাত তখন শহর ছেড়ে সত্যাশ্রমে পৌছে গেছে। কিন্তু শিকারীকে পাঠাতে হ'লো হাস্‌পাতালে।

চেরাপুঞ্জিগামী গাড়িতে ব'সে বিজন নানা কথার মধ্যে ডাকাতের কথাও ভাবছিলো। বলা যায় না, কৌমুদী ডাকাতদেরই ভিক্‌টিম্‌ হ'লো কি না! ম্যানেজার তো খোলসা ক'রে কোনো কথাই বললেন না! মরুক গে, কোমর পর্যন্ত চাদরটা টেনে নিয়ে বিজন টান টান হ'য়ে শুয়ে পড়লো।

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

বিজন যখন গাড়িতে টান টান হ'য়ে শুয়ে পড়লো, আশ্রম সংলগ্ন একটা মাটির ঘরে কৌমুদী তখন শুয়ে শুয়ে বিজনের কথাই ভাবছে, শিকারী ভদ্রলোকটির কথাও তার মনে পড়ছে। পাশ ফিরে শুতে গিয়ে কৌমুদীর গলা দিয়ে একটা স্বর হঠাৎ বেরিয়ে পড়লো : বিজনদা।

চলন্ত রেলগাড়ির কামরায় অর্ধনিদ্রিত বিজন চম্‌কে উঠ্‌লো, তাকে ডাকে কে? গায়ের চাদর সরিয়ে দিয়ে বিজন উঠে বস্‌লো। আড়াই বছর আগে যে-ডাক সে শেষবারের জন্যে শুনেছে, এই আড়াই বছরের গাঢ় অন্ধকারের স্তব্ধতা ভেদ ক'রে সেই গলার স্বরই তাকে চম্‌কিয়ে দিলো। জান্‌লা দিয়ে ছুটন্ত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বিজনকুমার সুদূর চেরাপুঞ্জির বৃষ্টিপাতের শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছে। রাস্তা আর যেন ফুরাতে চায় না। বিজন বড় বেশি অসহিষ্ণু হ'য়ে প'ড়েছে আজ। হবারই কথা। মনে মনে তৈরী হ'য়েও কি-কি কথা ব'লবে তার জোর মহড়া দিতে দিতে সে ছুটে এলো গৌহাটির হোটেলে, এসে দেখলো, কৌমুদী নেই! তার ওপর, ঘুমের ব্যাঘাত পর্যন্ত হ'তে আরম্ভ ক'রেছে তার! এমন তো হয়নি এর আগে। বিজন বেশ বুঝতে পারলো, সে দুর্বল হ'য়ে প'ড়েছে। কিন্তু পুরুষের পক্ষে এ-ধরণের দুর্বলতা মার্জনীয় নয়, তা সে জানে। জানলেও, প্রতিকারের কোনো উপায় তার নেই। যে-বিজন এতদিন কৌমুদীকে ভালোবাসতে পেরেও তার জন্যে অধৈর্য হয় নি, সে-ই বিজন এতদিন বাদে হঠাৎ আজ কেমন একটা নতুন রোমাঞ্চ অনুভব করছে। সেই রোমাঞ্চের সঙ্গে আবার কিছু পরিমাণ চাঞ্চল্যও যেন এসে প'ড়েছে। মনের বিশেষ অবস্থায় মনে বিপ্লব আসে। বিপ্লব একবার দেখা দিলে তা থামানো হ'য়ে ওঠে কঠিন। তখন মানুষের এমন এক পরিবর্তন এসে যায়, যা কিছুক্ষণ আগে অপ্রত্যাশিত ছিলো। বিজন নিজেই বুঝতে পারলো, সে যেন ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। চেরাপুঞ্জিগামী গাড়িতে একটি রাত্রির মধ্যে তার লম্বা যৌবনকালটা যেন

নিঃশেষে ফুরিয়ে গেলো। আশা উৎসাহ উদ্দীপনা ইত্যাদি নামক যে সব পদার্থ মানুষকে চাঙ্গা রাখে, হু-হু ক'রে সব যেন খরচ হ'য়ে গেলো এক রাত্রির মধ্যে। সারা রাত্রির চিন্তা গবেষণা ও বিশ্লেষণ ইত্যাদি তার এই ক্ষতির কারণ। সকালে যখন সে গাড়ি থেকে নামলো, তখন গত-বৈকালের বিজন ও এই-সকালের বিজনে প্রভেদ এক মহাসমুদ্র। মুখে তিন দিনের দাড়ি, গায়ের জামায় তিনদিনের কয়লার গন্ধ, মেরুদণ্ড অনেকটা বাঁকা, চুলে তিনদিনের রুক্ষতা।

তবুও, আশা উৎসাহ উদ্দীপনা যেটুকু অবশিষ্ট ছিলো তাও নিঃশেষ হ'লো তখন, যখন বিজন চেরাপুঞ্জির বাঙলোয় পা দিলো। কোথায় কৌমুদী!

কৌমুদী তখন সত্যপীঠের আশ্রমে ব'সে ইন্দুমতীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করছিলো। ইন্দুমতীর আহ্লাদের সীমা নেই, নতুন মেয়ে আশ্রমে ভর্তি হ'লেই কেন-যেন তার ফুর্তি বাড়ে। নিজের হাসি দিয়ে যত সহজে লোককে সে আপনার ক'রে নিতে পারে, এত অনায়াসে এ-আশ্রমে তা আর কোনো মেয়ে পারে না। সাধুবাবাও তার ওপর ভারি প্রসন্ন। রাখালের বিবাহিত স্ত্রী সে, আর ব'লতে গেলে রাখালই এ-আশ্রমের কর্ণধার, অর্থাৎ পাবলিসিটি অফিসার। ভদ্রাভদ্র মহলে সাধুবাবার নাম-প্রচার করার ভার রাখালের, এ-কার্যে সহযোগী তার যতীশ। রাখালের চেষ্টায় সত্য দিয়ে হোক্ মিথ্যে দিয়ে হোক্ সত্যাশ্রমের সুনাম বেড়ে চ'লেছে। সাধুবাবা অতএব রাখালের কাছে ঋণী, সেই জন্যেই ইন্দুমতীকেও খাতির করতে আইনত তিনি বাধ্য। ইন্দুমতীর কোনো অপরাধ রাখাল টের পেলে আশ্রমে কুরুক্ষেত্র লেগে যায়। সাধুবাবা তখন স্বয়ং এগিয়ে এসে বলেন, রাখাল, ছি॥ রাখাল থামে। তখন তিনি সন্দিহান রাখালের মনে এমন এক ধারণা বদ্ধমূল করার চেষ্টা করেন, যাতে ইন্দুমতী ভয়ানক বিশ্বাসী ব'লে প্রতিপন্ন হয়। অগাধ ভক্তি রাখালের

সাধুর ওপর। নতশিরে সে মেনে নেয়। এতক্ষণে নিবারণ কিম্বা কল্যাণের বুক থেকে একটা ভারি পাথর নেমে যায় যেন।

পাশের ঘরে কৌমুদী জেগেই থাকে, সব কথা শুনতেও পায়। আশ্রমের ওপর তার ভক্তি এই জন্যে হু-হু ক'রে বেড়ে ওঠে না। কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় আশ্রম প্রদক্ষিণ তাকে করতেই হ'চ্ছে।

উনআশী থেকে এগার বাদ দিলে কত থাকে? আঙুলের কড় গুনে কৌমুদী বার বার হিসেব করছে। এখনো আটষট্টি বার তাকে আশ্রম ঘুরতে হবে: অর্থাৎ এখনো ছু'মাসের ওপর! এখান থেকে পালাবে, তারও কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বিজনকে একটা চিঠি দেবে, তারও কোনো সুবিধে নেই। আশ্রমটা যেন একটা জেলখানা। চারদিকে লাল প্রাচীর না থাকলেও লাল শুরকির রাস্তাগুলোই এর বেড়া। ওর ওপারে যাবার আদেশ নেই কোনো মেয়ের! কোথায়ই-বা পোস্টাপিস আর কোথায়ই-বা রেলস্টেশন!

আটষট্টিবার আশ্রম-প্রদক্ষিণ মানে আটষট্টি মাইল পথ নীরস হাঁটা। এ হাঁটা যদি বাঁকে বাঁকে পাক খেয়ে হাঁটা না হ'য়ে সোজা রাস্তায় হাঁটা হ'তো তাহ'লে সে বাঁচতো। আশ্রমকে কেন্দ্র ক'রে এই বৃত্ত-রচনা তার আর সহ্য হ'চ্ছে না। ছি ছি, নানা কারণে যত-না ইন্দুমতীর ওপর তার অনেক বেশি রাখালের ওপর তার ঘৃণা বাড়ছে। যে-পুরুষ তার স্ত্রীকে বশে রাখতে না পারে, তার পুরুষ হবার মানে কী? সুধু সাধুসঙ্গ ক'রে স্ত্রীকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে এমন অন্ধ হ'য়ে থাকার অর্থ? নিজের অক্ষমতা বুঝি সাধু-ভক্তির অছিলায় গোপন করার চেষ্ট এটা? কৌমুদী ভেবে ভেবে হতাশ হয়।

সাধুজী ফকির লোক, তবে লোকে বলে, তিনি ফিকির জানেন। তাঁর নামে মস্ত একটা মঠ তোলার জন্যে তাঁর আগ্রহ ইদানীং বেড়েছে। তাই কাপ্তেন ভক্তদের তিনি বড় সুনজরে দেখছেন। যেহেতু লোককে না

ঠকালে লোকে টাকা ঢালে না, তাই তিনি বড় বেশি আশীর্বাদ করতে আরম্ভ ক'রেছেন সকলকে।

মঠ প্রতিষ্ঠার জন্যে চারদিকে অর্থ সাহায্য চেয়ে চিঠি পাঠানো হ'য়েছে। সাধুবাবা নাকি বলেছেন, হ'য়ে যাবে॥ তাই ভাবনা বিশেষ নেই, হ'য়ে যাবেই। তবে, চেষ্টা করতে হ'বে পুরোদস্তুর। দরজায় দরজায় কড়া নেড়ে যদি কড়ি আদায় করতে হয়, তাও স্বীকার। সাধুবাবা যখন ব'লেছেন, হ'য়ে যাবে॥ তখন হ'য়ে যাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগা দরকার। মঠের প্ল্যান তৈরী। জনৈক শিল্পীভক্ত কাঠ কুঁদে মিনিয়েচার একটা মঠ তৈরী ক'রে এনেছে। মঠের এই নমুনা দেখিয়েই চাঁদা আদায় করা হ'চ্ছে। যে সব ভক্ত দূরে থাকেন, তাঁরাও অল্পদিনের মধ্যেই এখানে এসে যাবেন, তাঁদের স্বয়ং সাধুবাবা আহ্বান ক'রেছেন। সেই জন্যে মঠের নমুনাটি একটি কাঁচের কেস্‌এ প্রকাশ্য জায়গায় রাখা হ'লো।

ইন্দুমতীর উল্লাসের অন্ত নেই, কেবল বলে, উঃ, কত টাকা। টাকার খই ছড়াচ্ছে সকলে। আমার সাধুবাবার নামে মঠ হবে। বাবার টাকার অভাব!

টাকা! ইন্দুমতী টাকার বড় ভক্ত। জানো পঞ্চমি, মেয়েদের টাকা-প্রিয়তা কত মারাত্মক! তোমার মত অতটা নিরাসক্তি যদিও অনুমোদন করিনে, তবে শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবী চৌধুরাণীর মতো নিবিড় আসক্তি যেন কারুর না থাকে। দেবী চৌধুরাণী বললাম অত্যধিক ভক্তিতে: তিনি আমার নমস্যা, প্রাতঃস্মরণীয়াও বটেন। প্রাতঃস্মরণীয়া, যেজন্যে অহল্যা কুন্তী তারা মন্দোদরী ও পঞ্চস্বামীসোহাগী পাঞ্চালী প্রাতঃস্মরণীয়া, ইনিও হয়ত সেই জন্যেই। ইন্দুমতীর বয়েস? ধরো, পঁচিশ! শারীরিক বয়েস পঁচিশ হলেও মানসিক বয়েস পনের; অর্থাৎ যে-বয়েসে নতুন শিহরণ আসে, কথায় কথায় গায়ে কাঁটা দেয়, সর্বদা গা ছমছম করে, সেই বয়েস। তুমি এ ডেঞ্জার-

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

জ্ঞান্ পেরিয়ে গেছো নিশ্চয়: তোমার মানসিক বয়েস এখন কতো—আঠারো না বিশ! হিসেবে দরকার নেই। নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে পাতা ভরাট করলে সমালোচকরা খাপ্পা হ'বেন। চলো, সত্যপীঠে চলো।

তিনজন ক্যাপিটালিস্ট ভক্ত এসে গেছেন। এঁরা মঠ নির্মাণের সম্পূর্ণ ভার নাকি নেবেন। অবশ্য আশ্রমে জনশ্রুতি এই। একজন তোমার প্রতিবেশী, অর্থাৎ টাঙাইলের দিক থেকেই এসেছেন, মুক্তাগাছার নামকরা বড়লোক, জমিজমা নাকি বিস্তর আছে, জমিদারই বলতে পারো; দ্বিতীয়জন রিটায়ার্ড সিভিলিয়ান, তিনকুলে কেউ নেই—বিয়েও করেন নি,—জমানো টাকা অঢেল, কলির কুবের (এ আখ্যা ইন্দুমতীর দেওয়া); তৃতীয়জন কুচবিহারের লক্ষপতি ব'লে খ্যাত, আসামের চা-বাগানের অধিকারী।

আশ্রম উৎসাহে ঝকমক্ করছে। প্রত্যেকের মুখ-চোখ দিয়ে উৎসব ফুটে বেরোচ্ছে। নারীকর্মীদের মধ্যে জ্যোস্না ইন্দুমতী নীহার কণা আর মুকুল সবচেয়ে বেশী উৎসাহী, পুরুষদের মধ্যে রাখাল কল্যাণ নিবারণ ও যতীশ। ইন্দুমতীরা কৌমুদীকে টানাটানি করলো, সে কিছুতেই তাদের সঙ্গে যোগ দিতে রাজী হ'লো না। কর্মী এখন অবশ্যই দরকার: পুজোর জন্যে ফুল সাজানো ও ফল কাটা, অতিথিদের জন্যে অভ্যর্থনা ও শিষ্টাচার, সাধুবাবার জন্যে তদারক ও তটস্থভাব।—এমন সময় কৌমুদী যদি কুঁড়ের মধ্যে কুড়ে হ'য়ে ব'সে থাকে তাহ'লে আশ্রমবাসিনী হ'য়ে লাভ কী? আশ্রম তো বিশ্রামখানা নয়! আর, বিশ্রাম মানে পরিশ্রমের পরের বিরতি। কৌমুদী কবে একটা খড় ভেঙে দু'টো ক'রেছে, শুনি! এরি মধ্যে তাঁর শরীর এত বিশ্রাম চায়!

জ্যোস্না ব'ললো, রোদ লেগে রং জ্ব'লে যাবে না, ভয় নেই!

ইন্দু ব'ললো, রূপের দেমাক আমরাও করতে পারি, করিনে।

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

নীহার আর কণা সমস্বরে ব'ললো, আদিখ্যেতা।

মুকুল নীরবে হাস্‌লো। হাসিটা এমন, যেন অমন কত রূপ সে অবহেলা করে ছেড়ে দিয়েছে।

সাধুবাবা সাদাসিধে ভদ্রলোক, ন-ভক্ত ব'সে তিনি আসর জমাট করেছেন। কবে ডেরাডুনে গিয়ে শাদা কাক ও লাল বক দেখেছিলেন, কাশ্মীরের মেয়েদের স্বাস্থ্য কেন অটুট থাকে, বদ্রিনাথে কবে এক সাধুর সঙ্গে দেখা— যাঁর জট পাঁচ ফুট লম্বা, ইত্যাদি নানারকম গল্প করছেন। সব ভক্তই সেখানে উপস্থিত। নবাগত ক্যাপিটালিস্ট ভক্তত্রয় কেবল দ্বিপ্রহরিক বিশ্রাম করছেন পাশের ঘরে। চিকের ওপাশে মেয়েরা ব'সেছে। ইন্দুমতী তখন চা-বাগানের আয় কত, আর ওর থেকে কত অজস্র পরিমাণে টাকা হাতে আসা সম্ভব, এই বিষয় আলোচনা করছে।

বিঘে দশেক জমি খরিদ করা হ'বে। জমির সম্পূর্ণ ভার নিলেন মহিম বাগচী, মুক্তাগাছার ভদ্রলোক ভার নিলেন ইঁটের, মসলার জোগান দেবেন সিভিলিয়ান ভদ্রলোক। এখন বাকি থাকলো মিস্ত্রী। এ-খরচ চালাতে হবে অন্যান্য ভক্তদের।

সেদিনের পরামর্শে এই প্রস্তাব পাশ হবার পর ইন্দুমতী ভারিক্কে নিশ্বাস ফেলে বললো, বাব্বা! দশ বিঘে জমি! চাট্টিখানি কথা নয় অমন। দাতার প্রাণ আছে!

গৌহাটির অপর পারে ব্রহ্মপুত্রের পাঁচ মাইল উজানে জায়গাও ঠিক হ'য়ে গেলো। এবং এই হাঙ্গামার মধ্যে এক অজ্ঞাত কারণে নিবারণে ও কল্যাণে রীতিমতো বক্সিং আরম্ভ হ'লো! ফলে, নিবারণের নাক ও কল্যাণের বাঁ হাত একটু ক্ষতিগ্রস্ত হ'লো। এত আনন্দের মধ্যে আকস্মিক এই বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধান করে যা জানা গেলো তার প্রতিবিধান করার আগেই কুচবিহারের ভদ্রলোকটির যাবার তাগাদা পড়লো। তাঁকে আর কিছুতেই

ধ'রে রাখা গেলো না। তাঁর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দুমতী হ'লো নিখোঁজ। আশ্রমের ইতিহাসে এমন দুর্ঘটনা এই নাকি প্রথম।

মহিম বাগচী! নামটা কৌমুদীর কানে যাওয়া মাত্র সে বুকের মধ্যে একটা হাতুড়ির ঘা খেলো। কুচবিহার, আসামের চা-বাগান! আর পরিচয়ের দরকার নেই। কৌমুদী চিনেছে। গোলাপদির কাছে এই চা-বাগানের গল্প লক্ষবার সে শুনেছে! কৌমুদীর হাত পা কাঁপছে: সত্যি তো তিনি চ'লে গেছেন? আবার ফিরে আসবেন না তো? ভগবান তাকে রক্ষা ক'রেছেন।

রাখাল সাধুবাবার সামনে ব'সে হাত জোড় করলো।

সাধুবাবা বললেন, ভাবিস্‌নে। সে সুখে আছে। পাপের মধ্যে থেকে সাধ্বী মা আমার বিদায় নিয়েছে। ভগবান তাকে পথে ডেকে নিয়েছেন। কাজে লেগে যা তোরা। কিসের মন খারাপ! আবার যদি মা আমার ফিরে আসে, দেখবি, সে দেবী হ'য়ে ফিরেছে। সে তো মানুষী নয়, রাখাল!

সেদিনের আশ্রম প্রদক্ষিণ করার সময় যতই ঘনিয়ে আস্‌চে, কৌমুদীর মন খারাপ হচ্ছে ততই। ঘর থেকে বের হ'তে তার ভয় করছে রীতিমত। বলা যায় কি, মহিম বাগচী না-ও যেতে পারেন! আশ্রমপ্রদক্ষিণের মুখে মুখোমুখী যদি দেখা হয় দু'জনের! ভাবতেই কৌমুদীর শরীরে কাঁটা দিলো। কিন্তু আশ্রম থেকে ইন্দুমতীর অন্তর্ধানের কথা ভেবে সে আশ্বস্তও হ'লো খানিকটা। কৌমুদী খুঁটিনাটি খবর শোনেনি, তবে তার মনে হ'চ্ছে ইন্দুমতীর অন্তর্ধানের সঙ্গে নিশ্চয় মহিম বাগচী জড়িত আছেন। কৌমুদীর এটা অনুমান। কিন্তু পঞ্চমি, আমাদের অনুমান নিশ্চয় নয়: এ-আশ্রম থেকে এর বেশি আমরা আর কিছু আশা করতে পারিনে। আর ইন্দুমতী যে এমন একটা ঘটনা ঘটাবে তা আমরা সকলেই জানতেম, কারণ তার জীবনের

পূর্বইতিহাসে এরই সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিলো। তার জীবনের ঘটনাগুলি যদি একে একে বিশ্লেষণ করো, তাহ'লে তুমি হতভম্ব হ'বে।

সেকি, আজ আবার তুমি চিঠি দিলে? মন ভালো ঠেকছেনা? তার আমি কি করবো? আমার লম্বা চিঠিটা শেষ করতে দাও! মাঝে মাঝে যদি এমন চিঠির সুড়সুড়ি দিয়ে বিরক্ত করো তাহ'লে এগোবো কী ক'রে? বাধা দিয়োনা, লক্ষ্মীটি। অত ভাবপ্রবণতা ভালো নয়। অসুখ বাড়ছে লিখেছো! অসুখটা কী বলো তো? বলেছি তো, মনের অসুখ ওটা। চুপচাপ থাকো, মন খারাপ ক'রে দিয়োনা। মন চঞ্চল হ'লে লেখায় মন বসেনা। তা'তে ক্ষতি তোমার, আমার নয়। যত চিঠি দেবে, উত্তর পেতে তত দেরী হবে।

জানো, কৌমুদীটা কী সাংঘাতিক মেয়ে! ইন্দুমতীর আশ্রম ছেড়ে পালানোর দু'দিন পরে আশ্রমপ্রদক্ষিণ করতে করতে হঠাৎ কোন ফাঁকে, লাল সুরকির রাস্তা পার হ'য়ে সে কোথায় চ'লে গেছে! কোথায় সে গেছে তা আশ্রমবাসীরা জানে না। অতএব তারা অনায়াসে একে ইন্দুমতীর পর্যায়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হ'লো। কিন্তু কৌমুদী এসেছে গৌহাটিতে। কৌমুদীর বড় আশ্চর্য লাগছে। তার ধারণা ছিলো আশ্রমটা বুঝি গৌহাটির ওপারে, কিন্তু তা তো নয়! সে কি তবে নৌকো ক'রে নদী পার হয়নি সে-রাত্রে! সেই নৌকো চেপে—অবিকল বোয়ালমাছের মতো যার আকৃতি! সনাতন তাহ'লে তাকে বুঝি কেবলই ঠকাচ্ছে।

সুধু সনাতন কেন, বিজনও তাকে ঠকাচ্ছে। গৌহাটিতে পৌঁছে সরাসরি সে বিজনদের বাসায় এসে উপস্থিত। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে বাড়ির সামনের বাগানটা পার হ'য়ে বারান্দায় উঠেই অস্বস্তিকর আবহাওয়ার মুখোমুখী দাঁড়ালো: বিজন নেই। সুধু নেই নয়, কোথায় আছে—তা-ও কেউ জানে না। কৌমুদীর বুক থেকে মস্ত একটা পাথর নেমে গেলো যেন, সে-যেন হাঁফ ছাড়লো: বাঁচা গেছে।

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

অতিথি-সৎকারের কোনো ত্রুটি হ'লো না অবশ্য। কিন্তু কৌমুদীর মনে হচ্ছিলো: এর চেয়ে অতিথিকে সৎকার করাই এদের যেন উচিত ছিলো। মনে মনে সে বুঝেছে-যে বিজনের নিরুদ্দেশের জন্যে দায়ী কৌমুদীই। কৌমুদীর জন্যেই যখন এ অঘটন, তখন তার ওপর এই সদয় ব্যবহার তার গায়ে স্থঁচের মতন ফুটছে।

বিস্তৃত বিবরণ দিলো উমা। নিভৃতে ব'সে কৌমুদীর কাছে একে একে সে সব বিবৃত করলো: চেরাপুঞ্জিতে গিয়ে যখন তার দাদা পৌঁছয় তখন তার চোখ দু'টো কী লাল। অচমকা কলেজ কামাই ক'রে অসময়ে চ'লে আসায় সবাই নাকি ভেবেছিল তার অসুখ। কিন্তু অসুখ নাকি তার নয়। তবে? কারণ কিছুই বলেনি তার দাদা। বার কয়েক শুধু চা খেলো। চুপচাপ ব'সে থাক্‌লো। তারপর সেই-যে বেরুলো আর তার দাদা ফিরলো না। কোথায় গেছে কেউ জানে না। চারদিকে টেলিগ্রাম গেলো, কেউ খবর দিতে পারলো না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো, তাতেও কোনো কাজ হ'লো না।

কৌমুদী স্থধু শুনেছে, একটাও কথা বলেনি। বড় মুস্কিল তো। গেলো কোথায় সে? আর গেলোই বা কেন? এমন ছেলেমানুষী বুদ্ধি তো তার এর আগে ছিলো না। এই গৌহাটীর ওই ঘরটীতে ব'সে যখন সে সনাতনের স্থরে স্থর মিলিয়ে গান করতো, তখন তার মুখের ভাবে এমন সম্ভাবনা কোনো দিনই ফুটে ওঠেনি-যে ওই ব্যক্তি একদিন নিরুদ্দিষ্ট হবে। কৌমুদী মাঝে মাঝে যখন সনাতনের সঙ্গে আস্‌তো, তখন সে বিজনের যে নির্ভাবনা ও স্থপ্রসন্ন মুখের ছবি দেখেছে তার সঙ্গে আজকের নেপথ্যবাসী বিজনের চেহারার দারুণ গড়মিল সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। তার যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না যে বিজন এমন অদ্ভুত হ'য়ে যেতে পারে। উমাকে সে সান্ত্বনা দিলো, তাকে অযথা কাঁদতে বারণ করলো। তার দাদা ফিরে আসবেই আসবে

ব'লে তাকে সে আশ্বাসও দিলো। সান্ত্বনার কথা বলা খুব সহজ: সান্ত্বনা গ্রহণ করতে পারা আদৌ সহজ নয়। উমার কান্না কৌমুদী থামাতে পারলো না, কিন্তু নিজের ভিতরকার কান্নার বুদ্বুদ চেপে রাখলো।

মুখে প্রবোধবাক্য ব্যবহার করলেও মনে মনে কৌমুদীর যথেষ্ট সন্দেহ ও ততোধিক আশঙ্কা বিজন সম্বন্ধে। ভুল মানুষে করবেই: পূর্ণাঙ্গ মানুষ হ'তে গেলে ভুল করা ও ভুল বোঝা অবশ্যম্ভাবী। মাত্রার বেশি ভুল হ'লেই মানুষ মানুষের চোখে খাটো হ'য়ে যায়, ক্ষ'লো হ'য়ে যায়। তখনই তা'কে বলা হয় তরল-প্রকৃতির লোক। বিজনের ভুলের মাত্রা বেশি কি কম, সে-বিচার আমরা করতে চাইনে, পঞ্চমি। কিন্তু কৌমুদীর সন্দেহ ও আশঙ্কা যে সত্য, এটা আমরা মেনে নিলাম।

বিজন আর ফিরবে না। তার বাবা-মা ভাই-বোন সকলে তাকে মন-প্রাণ দিয়ে দিনের পর দিন ডেকে গেলেও, সে ডাকে সে সাড়া দেবে না। বিজন এখন নতুন মানুষ, তার পৃথিবীর রঙ এখন আলাদা। এতো হঠাৎ মানুষের এমন অবিশ্বাস্য বদল এসে যেতে পারে, তা আমরা ভাবিনি। তার জীবন যেন উপন্যাসের নায়কের জীবন: লেখকের খুসিমত যেমন চরিত্রের অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে, এও যেন তেমনি। কথিত আছে, মনুষের জীবনধারা উপন্যাসবর্ণিত চরিত্রের জীবনধারার চেয়েও অদ্ভুত। কথাটা নিজের জীবনের ঘটনা দিয়ে বিচার ক'রে সত্যি ব'লেই বহুবার জেনেছি: আজ বিজনের কল্যাণে নতুন ক'রে তা জানলেম।

বিজন আর বিজন নয়, সে জীবনযুদ্ধের সৈনিক। সে কথা পরে হবে, এখন কৌমুদীর কথায় ফিরে আসি।

বিজন যখন গৌহাটিতে নেই: আর এখানকার হোটেলেই যখন সে একটা নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটিয়ে গেছে, তখন কৌমুদীর গৌহাটিতে থাকতে রীতিমত আতঙ্ক হ'লো। সেই শিকারী রসিক ভদ্রলোকটির পরিণতি কতদূর

গিয়ে ঠেকেছে, কৌমুদী তা জানে না। সাংঘাতিক কিছু হ'লে এতক্ষণ সে হয়ত শুনতে পেতো উমারই মুখ থেকে: অনেক প্রসঙ্গ নিয়েই তো আলোচনা হ'লো তাদের! হোটেল-সংক্রান্ত কথাবার্তাও যে হয়নি, তা নয়। কৌমুদী হোটেলে ওঠায় তার দাদা চেরাপুঞ্জিতে গিয়ে দুঃখ জানিয়ে এসেছে, এ-সংবাদও উমা দিয়েছে। কৌমুদী হোটেলের গল্প ভালো ক'রে শোনার চেষ্টা ক'রেছিলো, কিন্তু সে-প্রসঙ্গ চাপা প'ড়ে গেলো।

এই তো বিজনের ঘর। কৌমুদী মনে মনে নমস্কার করছে নাকি? তার চোখ দু'টি নমস্কারের ভঙ্গীতে বারবারই নত হ'য়ে আসছে ব'লে মনে হয়। দেওয়ালে তার ছেলেবেলার হাফপ্যান্ট পরা ছবি, টেবিলের ওপর স্কেল ও কম্পাস, কালীহীন দোয়াতদানি, ওইখানে ওই হার্মোনিয়ামের বাক্সটা, সেই সনাতনী যুগে যেখানে যেমনটি থাকতো, আজও সেইখানেই আছে, তবে তেমনটি নেই! কোথায়-যেন একটু ফাঁকা, কোথায়-যেন একটু ফাঁকি।

কৌমুদী গৌহাটিতে আর থাকতে নারাজ। কিন্তু উমা তাকে বাধা দেবেই। কৌমুদী কোথায় যাবে, কোথায় এতদিন ছিলো—সব সে উমার কাছে গোপন রাখতে চায়। উমা তাই তা'কে অসহায় ছেড়ে দিতে রাজি নয়। উমার বাবা-মা মুখোমুখী বাধা না দিলেও, তাঁদের মেয়ের মারফৎ তাঁরা অনুরোধ জানাচ্ছেন। বিপদ যখন আসে, তখন চারদিক থেকেই নাকি আসে! কৌমুদীর বিপদও কম হ'লো না। এক মাসের ছুটি নিয়ে হাওয়া বদল করতে এসে সে নিজেই বদল হ'য়ে যাবে নাকি? নির্ভর তার ওই সামান্য চাকরিটুকু! তা সে খোয়াবে কী ক'রে? একমাসের জায়গায় তিন মাস হ'তে চ'ললো যে! কৌমুদী বিচলিত হ'য়ে পড়লো। তা ছাড়া, বিজনের সন্ধানের জন্যে সে কিঞ্চিৎ ব্যাকুল। তার কেবলই মনে হ'চ্ছে, কলকাতার মতো শহরে পৌঁছতে পারলে সে-যেন একদিনের মধ্যে বিজনকে খুঁজে বার করতে পারবে। এ-ধারণা হওয়া বিচিত্র নয়। কেন না,

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

কলকাতা শহরটা যাদুকর। তা ছাড়া, এখানে একটানা অনেকদিন থাকলে হাঁফ ধরে, কিন্তু একে কিছুদিন ছেড়ে থাকলে দম আটকে আসে। এ-জায়গাটা বাঙলাদেশের হৃৎপিণ্ড: আমার তো এই ধারণা। তোমার কথা যদিও স্বতন্ত্র। হৃৎযন্ত্রকে একটানা বেশি খেলাও, হাঁফ ধ'রবে; একটানা এর কাজ বন্ধ রাখো, দম আটকাবে। আমার যুক্তি তুমি মানবেনা, কারণ তোমার কলকাতাতঙ্ক বেজায়, টাঙাইলাসক্তি অসাধারণ। কলকাতার পীচের রাস্তাকে তুমি বলো বিষধর সাপ, গম্বুজকে বলো বিস্ফোটক: তোমার দৃষ্টিকোণই আলাদা। আমার তাই ধারণা ছিলো-যে মেয়েমাত্রেরই দৃষ্টিকোণ বুঝি এই। কিন্তু কৌমুদীকে দেখে আমার সে সিদ্ধান্ত টিকলোনা। হৃৎপিণ্ড যেমন পাম্প ক'রে ক'রে শিরায় শিরায় রক্ত চালান্ ক'রে শরীরময় ছড়িয়ে দেয়, আবার নিজেরই মধ্যে সব রক্ত টেনে আনে,—কৌমুদীর ধারণা, বিজনকেও কলকাতা শহর তেমনি বিক্ষিপ্ত ক'রে দিয়ে আবার কেন্দ্রে টেনে নেবে। তার মনে হয়, কলকাতা মাধ্যাকর্ষণের লীলাভূমি। রুড়কির বিজন কলকাতার চুম্বকশক্তির নাগালের বাইরে হয়ত যাবেনা।

জীবনে যেন কত কিছু করার ছিলো, কত আশা ছিলো, আনন্দ ছিলো, কত সাধ ছিলো—সব এক নিমেষের মধ্যে দপ্ ক'রে নিবে যাওয়ার মত ফুরিয়ে গেছে যেন! কৌমুদীর এখন আর কোনো বন্ধনই যেন নেই। সে মুক্ত। এখন সে যত কিছু করার ছিলো, কিছুই যদি না করে—কাউকে তার কৈফিয়ৎ দেওয়ার আর কোনো দরকার নেই। দিনগুলো এখন-যেন খুব লম্বা, রাতগুলো ততোধিক দীর্ঘ। অবসর তার দু'হাতে যেন ধরা যায়না, এত বড়। ভারি চমৎকার লাগছে কৌমুদীর। অদৃশ্য একটা কিসের ওজন তার কাঁধের ওপর ঝোলানো ছিলো, এখন তা নেমে গেছে। নিজেকে বেশ স্বস্তিকর হাল্কা ব'লে তার বোধ হয়। এতদিনের অভ্যাসগত প্রতীক্ষা, মজ্জাগত উৎকণ্ঠা—কোথায় গেলো সব? অপরিসীম আনন্দে রোমাঞ্চ বোধ করছে কৌমুদী।

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

গণেশদা-হীন শিবানীর কথা অনেকদিন বাদে তার হঠাৎ মনে পড়লো। সোনামুখী গ্রামের পাড়া-প্রতিবেশী চেনা-অচেনা কত-জনের মুখ ভেসে উঠ্লো তাঁর চোখের সাম্নে। নিজেকে সে তুলনা ক'রে দেখতে চেষ্টা করলো তা'দের সঙ্গে। সেই তিস্তা-নদীতে যাবার বাঁকা শক্ত পায়েহাঁটা রাস্তাটি—আর সেই সঙ্গে কুচবিহারের সেই তেরছা পায়েহাঁটা রাস্তা, নুনে খাওয়া ইটের প্রাচীর—গোলাপদি, মহিম বাগচী, ইন্দুমতী! সকলে বায়স্কোপের ছবির মতো পর পর তার চোখে ফুটে উঠ্লো। ইন্দুমতী-হীন রাখালের কথা ভেবে তার দুঃখ হ'লো প্রবল। রাখালের এ-যে স্ব-রচিত দুঃখ : সাধুপ্রীতি থেকেই-যে এই দুর্ঘটনার আবির্ভাব, আজো রাখাল তা বোঝেনি ব'লে কৌমুদীর মনে রাখালের জন্যে সমবেদনাও জাগলো।

গৌহাটি ত্যাগ ক'রে কিছুদিন আগে কৌমুদী কলকাতায় ফিরে এসেছে। তিনমাস নেপথ্যবাসের পর তার আগমনে হাসপাতালের কর্ণধারেরা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হ'লেন : কিন্তু শেষ-বেশ কৌমুদীকে তাঁরা আবার-যে গ্রহণ করলেন, কৌমুদীর ভয়ানক সৌভাগ্য ব'ল্‌তে হবে। কেউ কেউ বলে, কর্তৃপক্ষের এই পক্ষপাতের জন্যে দায়ী কৌমুদীর চেহারা। তার মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ তাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করে, এমন শক্তি নাকি কারো নেই। কথাটা কতটা সত্যি, জানিনে। তবে, বর্তমানে কৌমুদীর চেহারা আগেকার মত তেমন নিটোল নিখুঁৎ নয়। নানারকমের অভিজ্ঞতার হাতুড়ির ঘা খেয়ে জায়গায় জায়গায় দাগ প'ড়েছে।

সেই মাথায় পটি বাঁধা, সেই পরণে এপ্রন : সোনামুখী গ্রাম ছাড়ার তিন বছর বাদে আমরা তাকে এইরূপে পেয়েছি। এরি মাঝখানে তার জীবনে কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেছে : গৌহাটি-হোটেলের নাট্যাভিনয়, সত্যপীঠের আশ্রম-প্রদক্ষিণ, ও চূড়ান্ত ঘটনা—বিজনের অন্তর্হিতি। কত দীর্ঘ রাত্রে

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

বিছানায় চিৎপাৎ শুয়ে কৌমুদী এই সব কথা ভাবে। অনুশোচনা হয় তার। সামান্য একটু ভুলের জন্যে কত বড় ক্ষতি হ'য়ে যায় মানুষের! কৌমুদী যদি পীড়াপীড়ি ক'রে তখন ছুটি না নিতো ও গৌহাটিতে না যেতো—তবে তার এত বড় লোকশান কখনই হ'তোনা বুঝি! সে যদি কলকাতার এই হাসপাতালে ব'সে রুড়কির ঠিকানায় চোখ বুজে ঢিল ছুড়তো, তা হ'লে বিজনকে এ ভাবে খোয়াতে হ'তোনা হয়ত। রুড়কিতে সে পড়বে, এ সম্ভাবনার কথা তার তো জানাই ছিলো—অতিমাত্রায় নিশ্চিত হ'তে যাবার যথেষ্ট পুরস্কার সে পেয়েছে। এবার থেকে আর হিসেব ক'রে কাজ সে করবেনা, এবার থেকে সে বেপরোয়া হবে! মেরুদণ্ডকে যথাসাধ্য শক্ত ক'রে সে কাজ করবে: অল্পে হতাশ ও অল্পেই ব্যাকুল হয়ে যখন তার পুরস্কার কিছু পাওয়া যায়না—তখন হতাশ হয়ে ও ব্যাকুল হ'য়ে লাভ? চোখের জল ও দীর্ঘনিশ্বাস একজোড়া প্রতারক: এদের হাত থেকে সে রেহাই চায়।

শুয়ে শুয়ে এই সব ভাবতে ভাবতে তার রীতিমত উত্তেজনা বোধ হ'লো: চোখের ঘুম হ'লো পলাতক। ঘরের মধ্যে পায়চারী ক'রে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। সন্ধ্যা দিব্যি ঘুমোচ্ছে, বেশ আছে ও। ওর ঘুম কত সহজ: ওর জীবন কত সরল। জীবনে আনন্দ চাই, এই প্রতিজ্ঞা ক'রে আনন্দ খুঁজতে বা'র হ'লেই জীবন পণ্ড হ'য়ে গেলো: আনন্দ তখন আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে নাগালের বাইরে গিয়ে নৃত্য করতে থাকে, তাকে আর ধরা যায় না। দূর দিগন্তের মত ক্রমশই সে পিছনে স'রে যায়—যতই তা'কে ছোঁয়ার জন্যে তার দিকে এগিয়ে যাবে, ততই ঠকবে! সন্ধ্যার দিগন্ত তার রীতিমত আয়ত্তে। নিরিবিলি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে দিগন্ত নিয়ে খেলা করে। সে নিশ্চয় ধরি-ধরি ক'রে তার পিছনে ধাওয়া করেনি, চোখের দৃষ্টি দিয়ে তা'কে বেঁধে রেখেছে, হাতের মুঠিতে

চায়নি। সন্ধ্যা সুখী। কৌমুদীর হিংসে হয় সন্ধ্যার ওপর। কখন-কখন একই সঙ্গে তাঁদের ডিউটি পড়ে, একই ঘরে তারা দু'জন থাকে, বন্ধুত্বও দু'জনের কম নয়—তবু কৌমুদীর হিংসে হবেই।

রাত্রে ডিউটি না থাকলে কৌমুদীর বড় কষ্ট হয়। যে-সপ্তাহে তার দিনের ডিউটি পড়ে সে-সপ্তাহে তার শরীর ও মন ভালো থাকে না। রুগীদের সঙ্গে জেগে জেগে রাত কাটানো এক রকম মন্দ নয়, কিন্তু ঘুমে-কাদা-হয়ে-যাওয়া সন্ধ্যার আবছা-আবছা মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পায়চারী ক'রে রাত কাটানো অসহ্য।

কোনো রাত্রে সন্ধ্যার ঘুম ভেঙে যায়, আশ্চর্য হ'য়ে বলে: ওকি রে, ঘুমোস্ নি ?

উঁহুঁ। ঘুম কিছুতে আসচেনা, ভাই। কৌমুদী পায়চারী করতে করতেই বলে।

সন্ধ্যা হাই তুলে জড়িত গলায় বলে, জল খা। চোখে মুখে জল দে। শুয়ে পড়। কাল ডিউটি করবি না ?

কথাটা কোনো রকমে শেষ ক'রেই সন্ধ্যা পাশ-বালিশ সুদ্ধ উল্টে দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে শোয়। কৌমুদীর জবাব পায়না।

কৌমুদী মুক্ত বটে, তবে তার মনে মারাত্মক একটি অভাব সব সময় তাকে সংকুচিত ক'রে রাখে। এ-অভাবটা ঠিক কিসের, তা সে জানেনা। এ-অভাব মোচন হবে কিসে তা-ও সে বলতে পারে না।

সিরিঞ্জে ওষুধ ভ'রে দ্রুত তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে সন্ধ্যা কৌমুদীকে ধমক দেয়: এই বোস-দা, চটপট চার্ট ক'রে নে, ভাবছিস্ কী ? মেট্রন এসে গেলো ব'লে।

সন্ধ্যা সাহুর আদি বাড়ি হয়ত উড়িষ্যায়, বর্তমানে যদিও খাঁটি বাঙালিনী। কৌমুদী তার অন্তরঙ্গ, সেও কৌমুদীর প্রধানতম সুহৃদ। এরা দু'জন

হাসি-ঠাট্টাও যেমন করতে পারে, কর্ত্তব্য-কাজও করতে পারে তেমনি নিপুণতার সঙ্গে। সন্ধ্যার মুখ সব সময় হাসি দিয়ে উজ্জ্বল করা থাকে, কৌমুদীর মুখে হাসিটা কিঞ্চিৎ কম—এ-ই যা পার্থক্য।

রুগীর গা ফুঁড়ে রক্তের মধ্যে ওষুধ চালান ক'রে দিয়ে সন্ধ্যা ফিরতি পথে কৌমুদীর হাতে একটা চিমটি কেটে চ'লে যাচ্ছিলো। চার্ট থেকে মুখ তুলে কৌমুদী ডাক্‌লো : এই সাহু-দা, শোন্।

আসছি। হাত-ইসারা ক'রে সন্ধ্যা চ'লে গেলো।

একটু পরেই ফিরে এসে ব'ললো, মেট্রন এসে গেছে। ডাকছিলি কেন?

বলছিলাম, পাঁচ নম্বর বেড্এর টেম্পারেচার কাল কে নিয়েছিলো?

পোড়ারমুখী তটিনীটা বোধ'য়, কেন?

একশ' তিন? হ'তে পারে না কিন্তু।

ওটা অম্‌নি। ডাক্তার সেনের পেট্ ব'লেই চাকরিটি আছে, নইলে—চোখ দু'টো অদ্ভুত ভঙ্গীতে পাক খাইয়ে সন্ধ্যা সাহু পাশের বেডে গিয়ে দাঁড়ালো দেখি জিভ।

এরা দু'টো দিব্যি আছে। প্রথম প্রথম আলাপের পর এ ওর নামের সঙ্গে দেবী শব্দটি জুড়ে সম্বোধন করতো। তারপর সম্বোধন ভাই-এ ও তুমি-তে নেমে আসে। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা যখন বেড়ে উঠ্‌লো তখন তারা আপোষে মীমাংসা ক'রে ঠিক করলো, আর সেকেলে ভাই-টাই চ'লবে না, এবার থেকে তারা উভয় উভয়কে দাদা সম্বোধন করবে। নামের সঙ্গে দাদা না জুড়ে পদবীর সঙ্গে দাদার অপভ্রংশ যোগ ক'রে তারা এ ওকে ডেকে থাকে।

সাহু-দার কাছে কৌমুদীর কোনো কথা গোপন নেই। গোলাপদি থেকে আরম্ভ ক'রে সাধুবাবা, আর গৌহাটীর বিজন থেকে আরম্ভ ক'রে চেরাপুঞ্জির বিজন, সব কথাই সন্ধ্যা জানে। অতএব সন্ধ্যার কান্তিদাদা (যিনি সব্যসাচী সেন নাম ধারণ ক'রে গল্প কবিতা লেখেন, তিনি) এই সব কথা যে জান্‌বেন,

এ আর বিচিত্র কী? কান্তি সন্ধ্যার মামাতো ভাই, সন্ধ্যার থেকে মাস দু'য়ের বড়, সেই দাবীতে দাদা। ছেলেটি অতি ছেলেমানুষ, নিরীহ, নম্র, বিনয়ী, তার ওপর ফুর্তিবাজ। লেখায় হাত ভাল। সন্ধ্যার মুখ থেকে কৌমুদীর ইতিহাস শুনে তার কল্পনা পাখা মেলে দিলো: কৌমুদীর সঙ্গে সে আলাপ করলো সশ্রদ্ধ বিনয়ের সঙ্গে। ভাবুকদের কাছে থেকে কৌমুদীর শ্রদ্ধা পাবারই কথা বটে। যারা কেবল জীবনের সিমেণ্ট-করা পাকা রাস্তা দিয়ে সটান সিধে চলে যায়, তারা কৌমুদীকে কী ভাবে জানিনে। কিন্তু যারা প্রত্যেকটা অলিগলি তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজে রাস্তা হাঁটে তারাই শহরের আসল রূপ দেখ্‌তে পায়: কৌমুদী তাদের কাছে বিস্ময়।

কিন্তু বিস্ময় বোধ করলো কৌমুদীই প্রথম, যখন কান্তি তা'কে দিদি ব'লে সম্বোধন করলো। কান্তির ব্যবহারে, কথা বলার ভঙ্গীতে, তার বুদ্ধির প্রখরতায় ও ভাষার সরসতায় কৌমুদী দ্বিতীয়বার বিস্মিত হ'লো।

কান্তি ব'ললো, আমি অনেক কথাই শুনেছি আপনার সম্বন্ধে, কিন্তু সব চেয়ে ট্র্যাজিক্ ঘটনা মনে হয় সাধু-সংসদ, যদিও আপনার জীবনের ট্র্যাজিডি চেরাপুঞ্জি।

তৃতীয় বিস্ময় কৌমুদীর। সন্ধ্যার ওপর মনে-মনে সে দারুণ চট্‌লো। বিশ্বাস ক'রে একটা গোপনীয় কথা তার কাছে বলার উপায় নাই! হ'তে পারে কান্তি তার আত্মীয়, কিন্তু কৌমুদীর সে কে? কৌমুদীর সব কথা জানার তার কি অধিকার? সংকোচে কৌমুদীর গা শিরশির করছিলো।

অযাচিত অনুগ্রহের সুরে কান্তি ব'লে যেতে লাগলো: আমার দ্বারা যতটা সম্ভব আমি করবো।

কৌমুদী সচকিত চোখে তাকালো: কিসের কথা বলছেন?

বিজনবাবুর কথা বলছিলাম, তাঁর খোঁজ করা দরকার না? তিনি হয়ত আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, আর আপনি এখানে বন্দী হ'য়ে ব'সে আছেন?

কান্তি বলে কী? বন্দী? কোথায় বন্দী সে? সে তো মুক্ত! তার মত এমন মুক্ত ক'জন আছে?

কৌমুদী ব'ললো, অতটা কষ্ট স্বীকার আপনাকে করতে বলিনে।

দেখুন কৌমুদী-দিদি, আপনিও অতটা ত্যাগ স্বীকার করবেন না। একবার চিন্তা ক'রে দেখুন, সেই ভদ্রলোক কত জায়গায় যেন আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁর মনের ভাবটা একবার কল্পনা করুন! কান্তির দুই চোখ ধূসর দেখালো, বললো, উঁহুঁ, তাঁর খোঁজ করা দরকার।

তবে করুন্ খোঁজ। কৌমুদী যেন তাকে অনুমতি দিয়ে উপকৃত করলো, তার বলার ভঙ্গীটা এমন।

করবো। গভীর চিন্তার তল থেকে একটা বুদ্বুদের মতো শব্দটি বেরিয়ে এলো।

কৌমুদী কান্তির চোখের দিকে তাকালো। তার দৃষ্টি তখন টেবিলের ফুলদানির গা ঘেঁষে টেবিল-ল্যাম্পের পাশ দিয়ে উন্মুক্ত জানলা পেরিয়ে বাইরে গিয়ে ফাঁকা হ'য়ে গেছে। সেই আবছা দৃষ্টি দিয়ে কান্তি দেখ্‌তে পাচ্ছে, একটি ছিপছিপে ছেলে তানপুরায় গম্ভীর সুর তুলে ডান হাত শূন্যে পাক খাইয়ে ধ্রুপদ আলাপ করছে।

কান্তি প্রায়ই আসে। তার কবি-সুলভ সরলতার গুণে কৌমুদীর প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠ্‌তে সে পেরেছে। কান্তির জীবনের এটা লাভ কি ক্ষতি, তা জানিনে। তবে, কৌমুদীর সত্যি লাভ। সহানুভূতির গদ্গদ ভাষা সে কান পেতে ধৈর্য ধ'রে শুনতে পারে না বটে, তবে কান্তির নির্ভীক বাক্পটুতায় সে মুগ্ধ। তটিনী জাতীয় কয়েকটি মেয়ে ইতিমধ্যে সরস পরিহাস করতে আরম্ভ ক'রেছে: কিন্তু কৌমুদী সে পরিহাসকে তেমন আমল দিচ্ছে না।

কান্তি ব'ললো, আমি বিজনবাবুকে দেখার জন্যে সত্যি বড় ব্যাকুল হ'য়েছি। কলকাতার নাম করা গানের আড্ডাগুলো আমি খুঁজলাম,

পেলাম না। আচ্ছা কৌমুদীদি, বিজনবাবু কলকাতায় আছেন, এ-কথা নিশ্চিত আপনার মনে হয়।

কেন হবে না। কৌমুদী একটু থেমে আবার ব'ললো, হয়। কিন্তু কেন, তা জানিনে।

কান্তি ব'ললো, আমারো হয় কেন-যেন। মনে হয়, এই বুঝি আমার পাশ দিয়ে রাস্তা হেঁটে চ'লে গেলেন, এই বুঝি আমারি সঙ্গে ট্র্যামে উঠ্‌লেন।

কৌমুদী ব'ললো, এ হ'লো নিছক কবিতা। আপনারা কবি, আপনাদের ও-রকম কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু আমরা নীরস-তরুবরও নই—একেবারে শুষ্ক-কাষ্ঠ, আমাদের মনে ও-সব অসম্ভব আশা ঢোকেই না।

ঠাট্টা করলেন? কান্তি হঠাৎ যেন চম্‌কে উঠ্‌লো।

হাই তুলতে তুলতে সন্ধ্যা এসে গেলো। রাত্রে রুগী পরিচর্যার পর দ্বিপ্রহরের নিদ্রাসুখ কতটা উপভোগ্য—সন্ধ্যার মুখে তার বিজ্ঞাপন আঁটা।

সন্ধ্যা এসেই ব'ললো, বোস-দা, সাবধানে কথা বলিস্ ওর সঙ্গে, ও বড্ড সেন্‌সিটিভ। দুনিয়ার সমস্ত লোক ওকে কেবল ঠাট্টাই করে!

কান্তির মুখ আরক্ত হ'লো, তার মুখ দিয়ে প্রতিবাদের কথাই বার হ'লোনা। কাপড়ের কোঁচা জুতোর ওপর ছড়িয়ে দিতে দিতে সে কী-যেন বলার চেষ্টা ক'রে হঠাৎ ব'লে ফেললো, চললেম।

বলার সঙ্গে সঙ্গে উঠে সে চলতে আরম্ভ করলো, এক মুহূর্ত আগেও সে চলার জন্যে তৈরি ছিলোনা। তার অসতর্ক মুখ থেকে হঠাৎ কথাটা অজানিতেই বেরিয়ে প'ড়েছে।

সাহু বললো, এই কান্তিদা, যাস্ কোথায়?

কৌমুদী ব'ললো, আচ্ছা মানুষ তো! মাথায় ছিট আছে নাকি?

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

কান্তি ততক্ষণে পীচের রাস্তা ধ'রে হন্‌হন্ ক'রে হেঁটে চ'লেছে।

অদ্ভুত! একই সঙ্গে সন্ধ্যার আর কৌমুদীর মুখ দিয়ে শব্দটা বেরিয়ে পড়লো।

অদ্ভুত! সেই সঙ্গে আমার মুখ দিয়েও শব্দটা বেরিয়ে এলো এইমাত্র, যখন খাম খুলে দেখলাম তোমার কাঁপা কাঁপা হস্তাক্ষর, তোমার অভিসম্পাতের ভাষা। অদ্ভুত ছাড়া আর কী বলবো? তুমি আমাকে অভিশাপ দাও! নীরব থেকে যেভাবে তোমার মনে যন্ত্রণার সৃষ্টি করছি তার শতগুণ জ্বালায় আমাকে নাকি জ্বলতে হবে। হাসি পাচ্ছে। কান্তির অদ্ভুত আচরণের কথা লেখা স্থগিত রেখে এখন যদি তোমার অদ্ভুত আচরণের কথা লিখতে আরম্ভ করি, তবে, হে পঞ্চমি, আমার কাহিনীর গতি ঠিক রাখবো কি করে? এই মাত্র কান্তিকে রাস্তায় হন্‌হন্ ক'রে হাঁটিয়ে দিয়েছি, ভেবেছি, তাকে নিয়ে এবার খানিকটা রহস্য করা যাবে। এমন সময় তোমার অভিশাপ! চিঠিটা তুমি শেষ করতে দেবে না? জানি, তোমার জ্বর একশ' ছয় ডিগ্রি। ও তো সামান্য ব্যাপার! শতকের ঘরে কেন, হাজার দু'হাজার জ্বরই যদি না হ'লো, তবে তোমরা মেয়েমানুষ কিসে? তোমরা তিল-কে তাল করতে ভালবাসো। অবিশ্বাস করছি ভেবোনা। স্বীকার করছি তুমি খুব অসুস্থ। শেলাই শেখানো হ'চ্ছে না, তার ফলে রোজগার ক'মেছে অর্থাৎ ব্যয় বেড়েছে। ডাক্তার নাকি ডাকবেনা—আমাকে ভয় দেখিয়েছ। আচ্ছা, আর দশ দিন সময় দাও। এর মধ্যে এ-চিঠি শেষ করবোই। এ-চিঠি শেষ করার আগে খুচরো একটা চিঠি দেওয়া যায় বটে, কিন্তু দেব না। একবার যে-প্রতিজ্ঞা ক'রে ফেলেছি, তা এত সহজে ভেঙে লাভ নেই। এই, হ'য়ে এলো ব'লে। আর দশটা দিন! এ ক'টা দিন সবুর করতে পারবে না? এবার দ্রুত চললো আমার কলম, হন্‌হন্ ক'রে কান্তিকুমারের মত।

কান্তির পলায়নের পরের পরদিন সন্ধ্যা একটি চিঠি পেলো:

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

কল্যাণীয়াসু, টাট্টার সারেগামা
নিখাদে নাকাল হাস্যের ধিধাপা-কে।
উদার উদারা ঘরিতে তারা-য় উঠে
তারায় তারায় টিটকারী দিতে থাকে॥
হয়ত পারেনি হয়ত মারেনি গাধা—
তবু তার কেন মানিনিয়ে সুরে সাধা?
তালকানা তাই কাঁদে শুধু পায়েমাথা।
বিদ্রূপ করে ছন্দের সানিমা-কে॥
সারিগমে আজ সারিগান গাও, নাচো।
আমি ভাল আছি, তোমরা কেমন আছো॥

চিঠিটা প'ড়ে সন্ধ্যা আর কৌমুদী হেসে অস্থির। কবিরা সাধারণ শ্রেণীর লোক নয়—এ কথা তারা স্বীকার করে; তারা যে অস্বাভাবিকও, এতটা যেন সন্ধ্যারা জান্‌তো না।

কান্তিকুমারকে কেন্দ্র ক'রে ক্রমশই তাদের মধ্যে নানারকমের আজগুবি গল্প আরম্ভ হ'লো। কোন্ দেশের কোন্ কবি কবে কি কি অদ্ভুত আচরণ করেন, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তারা অবসর সময়টা কাটাচ্ছে। তাদের গল্প কবির পর্যায় থেকে শিল্পীর পর্যায়ে নেমে এলো (যদিও কবি ও শিল্পী দুই নামের একই জীব ব'লে তারা জানে)। স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে তখন তারা পৌঁছে গেছে: শিল্পী ভ্যান্‌গো-র গল্পটা সন্ধ্যাকৌমুদীকে শোনালো: বেচারার সেই কানকাটার গল্পটা। একটা মেয়ের বায়নার জোগান্ দিতে গিয়ে বেকুব শিল্পীটা নিজের কান কেটে সেই কাটা-কানটি পার্সেল ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মেয়েটার কাছে। সন্ধ্যার কান্তিদা অবশ্য অতটা বেকুব নয়—সন্ধ্যা সগর্বে তা কৌমুদীকে শুনিয়ে রাখ্‌লো। তবে কান্তি নাকি একদিন একটা অচেনা মেয়েকে নিজের ছাতিটা দিয়ে তুমুল বৃষ্টি মাথায় ক'রে

ভিজতে ভিজতে বাসায় ফেরে। সে-কাহিনী নাকি আজো কান্তিকে শুনতে হয়।

কৌমুদী ব'ললো, কিন্তু সাহু-দা, এ তোর বড় অন্যায়! কান্তিবাবুর কাছে আমার গল্প করা তোর ঠিক হয়নি। উনি বিজনবাবু বিজনবাবু ক'রে আমাকে প্রায় ক্ষেপিয়ে তুলেছেন।

সন্ধ্যা হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ললো, কেন, বলে কি?

বলবেন আর কি! উনি নাকি বিজনবাবুকে খুঁজে বার করবেনই। বিজনবাবু নাকি যে ট্র্যামে উনি ওঠেন, রোজ সেই ট্র্যাম থেকে নেমে যান্: যে রাস্তায় উনি হাঁটেন সেই রাস্তা দিয়ে ওঁর গা ঘেষে চ'লে যান।

সত্যি? সন্ধ্যা আকাশ থেকে পড়লো: কই, আমাকে তো এ-কথা বলেনি! আচ্ছা চাপা ছেলে তো কান্তিদাটা!

কৌমুদী না হেসে পারলোনা: তুইও ক্ষেপ্‌লি, সাহু-দা? কল্পনা, কল্পনা!—তোর কান্তিদা নাকি রোজ কল্পনায় তাকে ওই ভাবে দেখেন।

সন্ধ্যা ব'ললো: এই? আমি ভাবলাম বুঝি গল্প, এ নিছক পদ্য তবে?

যা ব'লেছিস্! একেবারে নীরস পদ্য, সাহু-দা।

দরজার সামনে সশরীরে কান্তিকুমারের আবির্ভাব। সন্ধ্যাকে লেখা তার চিঠিটা তখনো কৌমুদীর হাতে। কৌমুদী সেটা আঙুলে জড়াচ্ছিলো আর গল্প করছিলো।

নীরস পদ্য? কান্তিকুমার সলজ্জ অথচ উদ্ধত পায়ে এগিয়ে এলো: কোন্‌টা নীরস পদ্য, কৌমুদী-দি? আমার লেখাটার কথা বলছেন? ওটা তো পদ্য নয়, ওটা চিঠি।

সাহু সহাস্য উল্লসিত গলায় ব'লে উঠ্‌লো: এখনো সারেনি, এখনো সারেনি মাথা। আটকে গেলাম। মাথা-র সঙ্গে কি মিল দেব, কান্তিদা? বলো! চুপ ক'রে রইলে কেন?

মাধা-র সঙ্গে? হঠাৎ এ-প্রশ্ন কেন? কান্তি নিষ্প্রভ গলায় বললো: মাধা মানে?

মাধা নয়, মাথা—তোমার মাথা। সারিগমের স্বর এখনো মাথার মধ্যে সরগরম বুঝি? মাথার রোগ তোমার আর সারলো না, কান্তিদা। ব'ললে হয়ত ব'লবে-যে ঠাট্টা করছি, কিন্তু ঠাট্টা নয়। তুমি মাথার চিকিৎসা করাও। সন্ধ্যা সবিনয়ে অনুরোধ করলো।

কৌমুদী বিপন্ন ভঙ্গীতে ব'সে ছিলো। প্রত্যেক মুহূর্তে সে আশঙ্কা করছে, এই বুঝি কান্তি তীব্র মন্তব্য ক'রে তীর বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু কান্তি হাস্‌লো। আশ্চর্য, কান্তি ছেলেমানুষের মত ঠোঁট টিপে হাস্‌ছে।

কান্তি ব'ললো, সন্ধ্যাটা দিন দিন চূড়ান্ত ফাজিল হ'চ্ছে।

যথা? সন্ধ্যা একটু যেন কান্তির দিকে ঝুঁক্‌লো: ফাজিলটা কোথায় আমায় পেলে, বলো! আচ্ছা বোস্‌-দা, তুই-ই বল্‌, আমি ফাজলামো করলাম?

কৌমুদী বললো, কী জানি! কার পক্ষ হ'য়ে কথা বল্‌বো, সেটা আমাকে আগে ব'লে দিতে হবে তাহ'লে।

উভয়পক্ষ হ'য়ে বলুন! কান্তি পরামর্শ দিলো।

কিন্তু কারু পক্ষ হ'য়েই কৌমুদী কথা বল্‌তে রাজি নয়। সে মনে মনে হাস্‌তে লাগ্‌লো আর মনে-মনেই সন্ধ্যার রচিত লাইনটা আওড়াতে লাগ্‌লো: এখনো সারেনি, এখনো সারেনি মাথা॥ সত্যিই, কান্তির পাগ্‌লামোটা বেশ উপভোগ্য লাগে কৌমুদীর। কবিদের বুঝি এমনি একটু আধটু মাথায় ছিট থাকে।

কান্তি বল্‌লো, বললেননা তো। বেশ, আমার পক্ষ হ'য়েই বলুন!

স্বার্থ! তা'তে বোস-দার স্বার্থ কী? মাঝখান থেকে সন্ধ্যা আপত্তি জানিয়ে উঠ্‌লো: তার-চে আমার দিক টানলে লাভ আছে; আমরা সব সময় এক সঙ্গে আছি, এ ওর সাহায্য চাই।

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

কেন? আমি কি কিছুই সাহায্য করতে পারিনে? আচ্ছা, বেশ! এই শেষ কথা শুনে রাখুন কৌমুদী-দি, বিজনবাবুকে যদি কেউ খুঁজে বা'র করতে পারে, তবে সে এই সব্যসাচী সেন।

লজ্জায় কৌমুদীর মুখ আরক্তিম হ'লো। সে সঙ্কুচিত হ'লো বেশি সন্ধ্যার কাছে। সন্ধ্যা হয়ত ভাবছে যে, কান্তিকে কৌমুদীই বিজনের খোঁজ করার জন্যে ক্ষেপিয়ে তুলেছে।

বিজনবাবু গান জানেন, আমি লিখি কবিতা। আচ্ছা আসি তবে। হঠাৎ কান্তি সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো: আবার আস্‌বো, সুবিধে পেলেই।

কান্তি চললো, দ্রুত পায়ে সে চললো। ঘরটা পেরিয়ে এক মিনিটের মধ্যে বারান্দা ডিঙিয়ে তরতর ক'রে সিঁড়ি বেয়ে শুরকির রাস্তায় জুতোর সরসর শব্দ করতে করতে হাসপাতালের এলাকা পার হ'য়ে সে সদর রাস্তায় পৌঁছে গেছে। রাস্তায় দু'পা হাঁটার পরেই একজনের সঙ্গে তার রীতিমত ধাক্কা লেগে গেলো। মুহূর্তের জন্যে দু'জন দু'জনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলো, সব্যসাচীর পোষাক সাধারণ বাঙালীর মত, আরেকজনের পরনে খাকির হাফ্‌প্যান্ট ও খাকির শার্টের ওপর পুরু কোট। উভয়পক্ষ একই সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বিপরীত রাস্তা ধ'রে চ'ললো। কেউ কারু পরিচয়টা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করলোনা। কান্তি বিজনকে এতো কাছে পেয়েও ছেড়ে দিলো! এই মাত্র সে কিন্তু কৌমুদীর কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রে এলো।

সাহু-দা ও বোস-দা ভেবে অস্থির। অনেকদিন কান্তির কোনো খবর পাওয়া যায়নি। ভাবপ্রবণ লোকদের নিয়ে কারবার করায় বিপদ অনেক। কোন্ সাধারণ কথা কিভাবে তারা গ্রহণ করে, বলা কষ্ট। আমি তোমার কাছে এ-চিঠি লিখ্‌তে অক্ষরে অক্ষরে ভেবে অস্থির হচ্ছি: তুমিও-যে ভাবপ্রবণ। তার ওপর তুমি অসুস্থ। সুস্থ অবস্থাতেই যখন তোমার মেজাজ ঠিক থাকেনা, এখন তো না থাকারই কথা। আমি লিখ্‌ছি আর ভাবছি,

শ্রীমতী পক্ষজী সমীপেষু

তুমি সুদূর টাঙাইল গ্রামের জনবিরল পল্লীতে তোমার লতাঘেরা ঘরে শুয়ে একা একা কাৎরাচ্ছ। হয়ত এ আমার কল্পনা। হয়ত তুমি ধীরে ধীরে সেরে উঠ্‌ছো। কিন্তু ভাবতে আপত্তি কি? একজন আর-একজনের জন্যে দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছে, এই কথা যখন আর-একজন জানতে পারে, তখন সে মনে মনে কি গর্বিত হয় না? —হয়। কিন্তু কৌমুদীদের হাসপাতালে যে-ভদ্রমহিলা গতকাল এসে ভর্তি হ'য়েছেন, এখন তাঁর জ্ঞান নেই। অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি অচেতন। তা না হ'লে তিনি হয়ত এই যন্ত্রণার মধ্যেও খানিকটা সান্ত্বনা পেতেন এই কথা ভেবে-যে তাঁর স্বামী তাঁর কুশলসংবাদের জন্যে উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষায় ভিজিটারদের ঘরে ব'সে আছেন। বার বার তিনি হাতের ঘড়ি ও দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। তাঁর মনে হচ্ছে, সময় যেন খোঁড়া হ'য়ে গেছে, চলতে পারছে না। প্যাসেজে কোনো নার্সের পায়ের শব্দ শুনতে পেলেই তিনি একটু সোজা হ'য়ে উঠ্‌ছেন, পরমুহূর্তেই হতাশ হ'চ্ছেন। তাঁর সাত বৎসরের বিবাহিত জীবনের এই প্রথম সন্তান হবার দিন আজ। সন্তানলাভের সমস্ত আশা যখন প্রায় নির্মূল হ'য়েছে, তখন হঠাৎ একদিন ঈপ্সিতের আগমনের সূচনা দেখে তাঁদের কী আনন্দই-না হ'লো। মাসের পর মাস তাঁরা কাটালেন উৎসবের পর উৎসব ক'রে। তাঁর ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী ছিল না, আজ তার আগমনের দিন। কিন্তু এ-দিন এত উৎকণ্ঠায় তাঁর কাটবে, তা তো তিনি ভাবেন নি। নতুন অতিথিকে অভ্যর্থনা করার জন্যে তিনি কলকাতার উপনগরীতে নতুন গৃহ-নির্মাণের আয়োজন ক'রেছেন।—

হঠাৎ সেখানে ধূমকেতুর মত আবির্ভাব ঘটলো সন্ধ্যার। ভদ্রলোকটি তাড়াতাড়ি সোজা হ'য়ে দাঁড়ালেন। সন্ধ্যা বললো, কেবিন টুয়েন্‌টিটু। আপনি? আসুন।

কৌমুদী এখন তার ঘরে ঘুমোচ্ছে: সারারাত ডিউটি ক'রে সে পরিশ্রান্ত।

ঘুমের মধ্যে সে বিভনকে ভাবছে, না, কান্তিকে ভাবছে ? সত্যপীঠের আশ্রম, শিকারী ভদ্রলোক অথবা উমার কথাও যে ভাবতে পারে বটে।

সন্ধ্যা ডিউটির মাঝ থেকে ছুটে এসে কৌমুদীকে ধাক্কা দিলো : এই বোস-দা, বোস-দা, ওঠ ! শোন, কেবিনের বৌ-টা মারা গেলো রে !

কে ? কে মারা গেলো ! মুখের ওপর এলোমেলো চুলের ভেতর থেকে স্তিমিত চোখে তাকিয়ে কৌমুদী উঠে বস্‌লো : কি বললি।

চট্ করে ওয়ার্ডে আয়। ভদ্রলোকের কাণ্ড দেখে যা, আহা বেচারা। কেবল ইংরাজি আওড়াচ্ছেন আর লাফালাফি করছেন, বৌটা তাঁর কথার জবাবই দিচ্ছে না।

বেবি ?

আর বেবি ! সন্ধ্যা তাচ্ছিল্যের সুরে বললো, বেবি আর হ'লো কই : হবার আগেই-যে ইতি ! আস্‌বি তো আয়, আমি চল্‌লেম।

সন্ধ্যা চ'লে যাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে কাপড় বদলে মুখে থেকে চুল সরিয়ে কৌমুদী ওয়ার্ডে এসে হাজির। বৌ-টার মুখ থেকে অসহ্য যন্ত্রণার ছায়া এখনো মোছেনি। টেবিলের চারদিক ডাক্তারে ও নার্সে বোঝাই। ভিড় ঠেলে কৌমুদী আর একটু এগিয়ে গেলো। যন্ত্রণার ছায়ার ভেতরেও বৌ-টার কষ্টসহিষ্ণুতার ছবিও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

কৌমুদীর পাশ থেকে শব্দ এলো : With your permission, ডাক্তারবাবু, আমি ওর মুখটা ঢেকে দিতে পারি ?

কৌমুদী চমকে উঠলো। শব্দ লক্ষ্য ক'রে তাকাতেই দু'জন চোখাচোখী প'ড়ে গেলো। শিকারী ভদ্রলোক অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে। কৌমুদী আশ্চর্য হ'য়ে গেলো, ভুজালীটা তবে তা'কে সেদিন প্রতারণা ক'রেছে !

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

আপনি, আপনি এখানে ? শিকারী ভদ্রলোক হয়ত কৌমুদীর দিকে এক পা এগোলেন।

সন্ধ্যা কৌমুদীর দিকে তাকালো, কৌমুদী তা লক্ষ্যই করলো না, ভদ্রলোকের প্রশ্নের জবাব দেবার কথাও তার হারিয়ে গেছে যেন। ব'ললো, রুগী দেখ্‌তে।

এর কিছুদিন বাদে আর একটি কেবিনে অসুস্থ কৌমুদী জ্বরের ঘোরে প্রায় অচেতন অবস্থায় শুয়ে ছিলো, পাশ ফিরে তাকাতেই সে-যেন পরিচিত একটা মুখ দেখে চম্‌কে উঠলো, ভয়ার্ত চোখে সে ব'ললো, আপনি, আপনি এখানে ?

শিকারী ভদ্রলোকটি ব'ললেন, রুগী দেখ্‌তে।

তবে এখানে কেন ? যান্‌! অনুনয়ও নয় আদেশও নয়, কৌমুদীর রুগ্ন গলায় কোনো ভাবই ফুটলো না।

কোথায় যাবো ?

রুগী দেখ্‌তে।

রুগীই তো দেখছি। কেমন বোধ করছেন এখন ? ভদ্রলোক একটু ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বস্‌লেন : হঠাৎ এমন হ'লো কেন ? জবাব দিন ! ওকি, চাদর সরান মুখ থেকে ! নাঃ, আপনি বড় ছেলেমানুষ।

কৌমুদী নীরব। ভেতরে রোগের যন্ত্রণা, বাইরে থেকেও হাজির হ'লো আর একটি rogue, তার অসুস্থতাবোধ বেড়ে গেলো।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর শিকারী ভদ্রলোক দার্শনিক গাম্ভীর্যে ব'লতে লাগলেন, আমার স্ত্রীর অভিশাপ এটা। যেভাবে তাকে আমি উপেক্ষা ক'রেছি, সেই ভাবেই উপেক্ষা পাচ্ছি। আপনার দোষ নেই।

কৌমুদীর অসহ্য বোধ হ'লো, বললো, উঃ !

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

খুব যন্ত্রণা হ'চ্ছে বুঝি? শুনলাম ডানদিকের লাঙ্‌এ প্যাচ দেখা গেছে। হঠাৎ এমন হবার মানে কি বলুন তো! শিকারী ভদ্রলোক লক্ষ্য স্থির করে ভালো হ'য়ে বস্‌লেন।

কৌমুদী শুয়ে শুয়ে যত দূরে তাকানো সম্ভব তাকিয়ে সাহুদাকে খুঁজলো। সাহু নেই, মার্গারেট তখন ওদিকে রুগীর মুখে ওষুধ ঢালছে। এই ট্যাঁশ-মেয়েটির সঙ্গে তার বিশেষ বনিবনা না থাকায় সে তা'কে ডাকলো না, কিন্তু তার বুকের ডানদিকের ব্যথাটা বেশি বোধ হ'তে লাগলো। দুঃখের সময় পরম আত্মীয়ের দূরে স'রে থাকার চিরকালীন নিয়মের কথা একদা সে সনাতন-বিয়োগের পর মনে ভেবেছিলো, আজ অনেকদিন পরে সেই কথাটিই তার মনে খোঁচা দিলো।

অমন করছেন কেন?

বিরক্ত হ'য়ে কৌমুদী ব'ললো, কেমন করছি? আপনি আজ যান্‌।

কি অসুবিধে হ'চ্ছে, বলো! শিকারী ভদ্রলোক একটু গদগদ গলায় ব'ললেন, যাতে আরাম হয় তার চেষ্টা করতে পারি! তুমি ব'লে ফেললাম, রাগ ক'রোনা।

রাগ বা অভিমান করার মত মনের বা শরীরের অবস্থা তার নয়। অথচ তার এখন ভীষণ রাগ হলো। হাসপাতালের এক নিরালা কোণে নিরিবিলি সে শুয়ে ছিলো, হঠাৎ সেখানে এভাবে সে এমন অনাহুতের আবির্ভাব আশা করেনি। কিন্তু মানুষ যা আশা করে না তাই হয়, যা আশা করে তা দুরাশা মাত্র। সাহু-টা এখন উধাও হ'য়েছে।

আপনি আমাকে একটু জল দিন্‌।

জল? শিকারী ভদ্রলোকের হৃদয় হয়ত জল হ'য়ে গেলো, বললেন, এই সামান্য ব্যাপারের জন্যে এত ছটফট করছো, কিন্তু বলছো না! এই নাও। সে কি, আমি ঢেলে দিচ্ছি, শোও।

সনাতনের মুখে এইভাবে কৌমুদী বাণী ঢেলে দিতো।

শিকারী ভদ্রলোকটি ব'ললেন, শিকারে বেরিয়ে অনেকদিন পরে ফেরার পর আমার স্ত্রী জিজ্ঞেস ক'রেছিলো আমার বুকের ডান দিকে কাটা দাগটি এলো কোথা থেকে: আমি কিছু বলিনি। কিন্তু তার ধারণা হ'য়েছিলো, ওটা বাঘের থাবা। তাই আমাকে বলতো, আর শিকার ক'রে কাজ নেই। তা'কে উপেক্ষা ক'রেছি বরাবর, আজও সে অভ্যাস ছাড়তে পারিনি। সে-রাত্রে তুমি যেভাবে আচমকা আমাকে আক্রমণ করলে তা ভেবে আজও আমি ভয়ে কেঁপে উঠি। জানো, রাগী বাঘের চোখ দেখেও আমার নিশানা ঠিক থাকে, হাত কেঁপে যায় না, কিন্তু—যাক্‌গে। দোষ আমারি, ভেবে দেখেছি। আগে চাই আন্তরিক টান, সান্নিধ্য পরে। আমার হিসেব ভুল হ'য়ে গিয়েছিলো, কিন্তু কী আশ্চর্য বলো, টান যদি না-ই থাকবে তা'হলে আবার এ-ভাবে দেখা হয়? কি, আর একটু জল দেবো?

না। জল চাইনে। শ্রান্ত গলায় কৌমুদী ব'ললো, আমি একটু ঘুমবো।

ঘুমোও। দেখি, বালিশটা ঠিক ক'রে দিই। ভদ্রলোকটি কাজে লেগে গেলেন। ব'ললেন, রোগের ওষুধের চেয়ে পরিপূর্ণ বিশ্রাম ও অপর্যাপ্ত ঘুম বেশি উপকারী।

নাঃ! কিছুতেই তার রেহাই নেই। সাহু সাহু সাহু। আর যেন সে না আসে। তার ওপর কৌমুদী ভয়ানক রেগে যাচ্ছে। সে কি জানেনা-যে, বন্ধু-হিসেবে না হোক্‌ নার্স-হিসেবেও মাঝে মাঝে তার রুগী দেখে যাওয়া কর্তব্য।

এমন সময় এলো কান্তি। বিনা ভূমিকায় সে ব'লে যেতে লাগলো: আশ্চর্য, আপনার অসুখ? কী আশ্চর্য, কিছু জানিনে। দেখুন, দু-তরফা অভিমান হ'লেই সংসার অচল হ'য়ে যায়। আমি না-হয় আসিনে, আমাকে ডেকে পাঠাতে হয়।

শ্রীমতী পদ্মশ্রী সমীপেষু

কান্তির অপ্রত্যাশিত আগমনে কৌমুদী অনেকটা হাল্‌কা বোধ করলো। তার দু-বেণী করা চুল এলোমেলো ও রুক্ষ হ'য়ে গেছে। কান্তি চুল সরিয়ে কপালে হাত দিলো। শিকারীকে সে-যেন লক্ষ্যই করেনি। ব'ললো, জ্বর এখনো আছে। শুনলাম প্লুরিসি। ছুটে এলাম। এখানে এসে মেট্রনের কাছে শুনলাম নিমুনিয়া।

চেয়ার ছিলো বিছানার পাশে একটাই, সেটি শিকারী অধিকৃত। কান্তি হাস্‌পাতালের নিয়ম জানে, তবু সে কৌমুদীর বিছানার একপাশেই ব'সে পড়লো।

কান্তি এতক্ষণে বললে, ইনি কে, কৌমুদী-দি?

কৌমুদীর জবাব দেওয়ার আগেই শিকারী ভদ্রলোকটি আত্মপরিচয় দিলেন: আমাদের আলাপ হয় গৌহাটীর হোটেলে। আমি এখানকারই বাসিন্দে যদিও। আপনি?

আমি? কান্তি নিজের বুকে বুড়োআঙুল ঠেকিয়ে ব'ললো, আমার পরিচয় চান্? আমার পরিচয় কি কেবা বলুন্! আমি কেহ নই, আমি সুধু এক কবি;—এ গল্পটা জানেন? জানেন না? তবে, সোজা ক'রে বলি শুনুন্, আমি ধূমকেতু! হঠাৎ আসি হঠাৎ পালাই। চ'লে তো যাই, কিন্তু কিছু একটা কাণ্ড না ক'রে যাইনে।

অর্থাৎ? শিকারী ভদ্রলোকটি তাঁর বয়সোচিত গাম্ভীর্য ধারণ ক'রে ব'ললেন: একটু একটু বুঝতে পারছিলাম, আবার সব গোলমাল হ'য়ে গেলো।

কৌমুদী অনেকটা আরাম বোধ করছে। তার মুখ এখন একটু উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। কান্তি সেদিকে একটু তাকালো, বললো, গোলমাল হবার কিছু নেই। আমি একজন পরিচয়হীন যুবক,—কবি কীট্‌স্‌কে চেনেন? দেয়ার-ওয়াজ-এ-নটি-বয়,-অ্যাণ্ড-এ-নটি-বয়-ওয়াজ-হি—এ গল্পটা জানেন?

জানেন না, তবে তো মুস্কিল। যদি বলি, আয়্যাম্ এ নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ডগ ওয়াগিং মাই লিটারারী টেল, তাহ'লে কিছু নিশ্চয় বুঝবেন? বুঝবেননা? তবে শুনুন, আমি এঁর ভাই। এবার আপনি নিশ্চয় বুঝেছেন? এখনো আমি হয়ত সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হইনি, কি-রকম ভাই, তা বলিনি। সেটা আর বলবোও না। হাস্‌চেন? ঠাট্টা ভাবছেন? দেখুন, ভদ্রতাজ্ঞান আমার কত বেশি। আমি আপনার পরিচয় চাইলাম, আপনি দু'কথায় সংক্ষিপ্ত-সার জানালেন। আর আমি! আমি খুঁটিনাটি ক'রে একেবারে নিজেকে মেলে ধরলাম।

কৌমুদী কান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, তার ঠোঁট দু'টো একটু ফাঁক করা। কান্তির আচরণ দেখে সে অবাক হ'য়ে গেছে। আজ হয়ত কান্তি মুডএ আছে।

শিকারী ভদ্রলোকটি ব'ললেন, এবার উঠি। আবার কাল আস্‌বো। নমস্কার, আপনার নামটা কিন্তু—

কান্তি ব'ললো, পরিচয়টা নামের গণ্ডি টেনে সংকীর্ণ ক'রে দেবেন না, আমার নাম কান্তি কুমার। অনেকে ভুল করে, বলে, কান্তিকুমার।—তারা পদবী জানতে চায়। কুমার আমার মধ্যমা নয়, প্রান্তিকা। আচ্ছা নমস্কার, আবার দেখা হবে।

শিকারী ভদ্রলোক চ'লে গেলে কান্তি বললো, এবার বলুন, কেন অসুখ করলো!

বা রে! অসুখ কেন করলো! আজ কি হ'য়েছে আপনার, খুব ফুর্তি দেখছি। খুব কথা বলছেন। কোন শুভসংবাদ—

নিশ্চয়! দারুণ শুভসংবাদ, কৌমুদী-দি। দিগ্বিজয় ক'রে এসেছি: আমি অপবাদ বহন ক'রে এসেছি।

অসুখের মধ্যেও কৌমুদীর উৎসাহ কম নয়, বললো, কি রকম?

কি রকম, শুনবেন? বলতে নিজেরই ঘৃণা বোধ হ'চ্ছে। শুনুন, না বললে আরাম পাচ্ছিনে। কিছুদিন আগে কোনো-এক বন্ধুর বৌ-এর কোনো এক গোপনীয় অসুখের জন্যে বন্ধুকে নিয়ে কোনো-এক আত্মীয় ডাক্তারের কাছে যাই। ডাক্তারটির ধারণা হয়, বন্ধু শিখণ্ডি, দায় আমার। তিনি রটান কুৎসা। কুৎসা সংক্রামক ব্যাধির সামিল, আপনি জানেন।—অচিরে ছড়িয়ে পড়লো আত্মীয়মহলে। সেই সুযোগে কোনো এক আত্মীয়া অজ্ঞাত-কারণে কুৎসা-কাহিনী আরো ফেনিয়ে তোলেন। এতেও আপত্তি ছিলোনা। দয়া ক'রে, উদ্বৃত্ত দয়া তাঁর, তিনি রটনা করেন, যা রটনা করেন—বুঝতেই তো পারছেন! আর ব'লে লাভ কি? কি ব্যাপার জানেন, ঘৃণাবোধ কেন হয় জানেন? সেই আত্মীয়াটি আমারি সঙ্গে আমার বাল্যে কিছুকিছু ছেলেমানুষী করতেন। আমি তখন তাঁর হাতে আত্মসমর্পণ ক'রে আড়ষ্ট হ'য়ে তাঁর পীড়ন সহ্য করতাম: প্রতিবাদের সাহস পেতাম না। আজ তিনি সাধ্বী সেজে এ-ভাবে আমাকে ঘৃণিত করবেন, এতটা আশা করিনি, কৌমুদী-দি। আত্মীয়াটি আমার চেয়ে হয়ত কিছু বড়, বয়সের সেই সুবিধে তিনি এভাবে নেবেন, এতটা আশা করা যায়না। অশেষ গুণ তার কৌমুদী-দি, অশেষ গুণ। তার ভাইএর মৃত্যুর কারণ সে। একই সঙ্গে বহু প্রেমিকের লীলাসঙ্গিনী হবার দরুণ, তার প্রেমে অন্ধ তারই খুড়তুতো ভাই অসহ্য আত্মগ্লানিতে আত্মহত্যা করে। বিয়ের পরেও এই ব্যাধি তার যায় না, ফলে একবার তার স্বামীও তাকে পরিত্যাগ করে কিছুদিনের জন্যে। কি নাম তার? নাম শুনে কি করবেন বলুন! নামটা গোপন থাক্। বলুন কৌমুদী-দি, পৃথিবীতে এমন মানুষ কেন থাকে? পৃথিবীর একী লীলা!

কৌমুদী হাসবার চেষ্টা ক'রে পাশ ফিরে শুলো। বললো, কত রকমেরই মানুষ আছে! যার মন যে-সুরে বাঁধা, সে সেই সুরই শুনবে।—ভিন্ন সুর থাকতে পারে, এ ধারণা তাদের থাকতে পারে না। ওর জন্যে মন খারাপ

ক'রে লাভ নেই। চাঁদেরও কলঙ্ক আছে, সেজন্যে চাঁদ কি মুখ ভার ক'রে বসে থাকে? সে হাসিমুখে চলাফেরা করে, নিজের কলঙ্ক নিয়ে সে এতটুকু বিপন্ন নয়, এতটুকু ভাবিত নয়, কান্তিবাবু। কেন মন খারাপ করছেন?

প্রতিশোধ চাই! কৌমুদী-দি, কুনামের তাপে আমি জ্বলছি না, প্রতিহিংসার আগুনে পুড়ছি। আমার ইচ্ছে করছে, কি ক'রে আমি তার স্বরূপ প্রকাশ ক'রে দিই।

চুপ করুন্। সাহু-দা নেই এদিকে? একবার দেখুন না।

না। আমি এবার যাবো। সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা করতে গেলে সন্ধ্যে হ'য়ে যাবে, আমার অনেক কাজ,—জানেন না তো, কত কাজ আমার! কান্তি উঠে দাঁড়ালো।

কৌমুদীর ভারি হাসি পেলো কান্তির পাগলামোতে। সে তার মুখের দিকে তাকালো, চোখ দু'টো যেন জ্বলছে: রাগী বাঘের চোখের মত।

কান্তি ব'সে পড়লো: না, কিছু কাজ নেই। কাজ কাজ কাজ। কি হবে কাজ দিয়ে? কিছুদিনের ছুটি নেব আমি—হয় পুরী, নয় নৈনিতাল—চ'লে যাব বেড়াতে। আচ্ছা কৌমুদী-দি, মানুষে কাজ করে কেন বলুন তো? তাদের হাতে সময় অপর্যাপ্ত, মানুষ কাজ চায় না, সময় খরচ করতে চায়।—তাই না? সময়ের সম্মুখের ঝুঁটি ধরার চেয়ে সময়ের টুঁটি টিপে মেরে ফেলাই আমাদের উচিত।

এই যে কান্তিদা-যে। কি রে বোস্-দা, আছিস্ কেমন?

ছাই আছি। কৌমুদী সাহুর উল্‌টো দিকে পাশ ফিরলো।

কান্তিদার এতদিন পাত্তা পাওয়া যায়নি কেন? হঠাৎ কি মনে ক'রে এলে?

কান্তি ব'ললো, কৌমুদীদি কিন্তু চ'টেছে।

কেন?

তুমি জিজ্ঞেস করো, আমি পালাই।

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

বলা মাত্র সে সত্যি সত্যি উধাও হ'য়ে গেলো, এতটুক স্বর সইলোনা।

জানিস্ সাহু-দা, তোর কান্তিদা আমাকে কী বাঁচান বাঁচিয়েছে। কাহিল গলায় কৌমুদী ব'ললো।

সাহু তার দিকে সাতঙ্কে তাকালো : আমি ছিলাম অপারেশন থিয়েটারে, আসতে পারিনি—তোর বুঝি ব্যথা বেড়ে গিয়েছিলো?

ব্যথাই বটে! শিকারী এসেছিলো, যেতে চায়না! কি যন্ত্রণা বল্ তো! ওকে এখানে আস্তে দিলো কে?

বলিস্ কি? সরাসরি এখানে? কি বলে সে?

পরে শুনিস্ ভাই, টেম্পারেচারটা নে। কৌমুদী নিশ্বাস ফেললো।

প্লুরিসিও নয়, নিমুনিয়াও নয়। যাকে বলে সর্দিজ্বর, কৌমুদীর তা-ই হ'য়েছিলো, তবে আক্রমণের তেজ ছিলো কিছু বেশি। ব'লেছি তো, মেয়েদের তিল-কে তাল করা স্বভাব। তুমি চটছো নাকি, পঞ্চমি? তোমার অসুখ, ভগবান করুন, অমনি চট্ ক'রে আরাম হ'য়ে যায়!

কান্তি কৌমুদীর মাথার কাছে ব'সে গল্প করছিলো। কৌমুদীকে এখনো কিছুদিন বিশ্রাম করতে হবে—ডাক্তারদের নির্দেশ। জ্বর এখনও নিরান্নব্বই পর্যন্ত উঠছে, নিরান্নব্বই-এর ধাক্কায় প'ড়েছে সে। তার জ্বর নিয়েই এদের আলোচনা চ'লেছে, এমন সময় শিকারীর আবির্ভাব, তাঁর সঙ্গে ঝুড়িসহ একটি কুলী। ঝুড়িতে কিছু মেওয়া : কৌমুদীর রোগের পথ্য। যখন ভদ্রলোকটি কুলীকে বিদেয় দিয়ে ঝুড়ি থেকে এক একটি ক'রে ফল আর থোকা ধ'রে আঙুর বা'র করছেন, কৌমুদীর তখন হাসিও পেলোনা কান্নাও পেলোনা। সে কান্তির দিকে তাকালো।

সযত্ন পারিপাট্যের সঙ্গে ফল ছাড়িয়ে আঙুর গুছিয়ে ভদ্রলোকটি বল্লেন, খান।

ক্ষেপেছেন? কৌমুদী মুখ সরিয়ে নিলো: ওই দেখুন ফল সব পচছে, একেবারে খেতে ইচ্ছে করে না।

ইচ্ছে করে না বললে তো শুনছিনে! বাঁচতে হবে তো! শিকারী আন্তরিক গলায় বললেন।

কৌমুদী ব'ললো, নতুন আর কি বললেন? কিন্তু বাঁচার জন্যে খাব, খাবার জন্যে বাঁচতে নারাজ। আপনি রাখুন ও-সব। কেন অযথা আনলেন?

কান্তি বললো, খান্ না। চাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌তে হবে তো!

আপনি খান্। কৌমুদী হয়ত একটু রেগে বললো।

শিকারী ভদ্রলোকও কান্তিকে অনুরোধ করলেন: বেশ মিষ্টি আঙুর, খান না। একটু টেস্ট ক'রে দেখুন।

আমাকেও রুগী পেলেন?

কৌমুদী ব'ললো, রুগী না হ'লেই বুঝি খেতে নেই, খান্।

শিকারী ভদ্রলোক লক্ষ্য করলেন, কৌমুদী তার ভাইকে বরাবরই আপনি বলছে। এর কারণ তিনি কিছু বুঝতে পারলেন না। জিজ্ঞাসা করতেও বাধ-বাধ ঠেকছে। ভদ্রলোকটি চেয়ারে বস্‌লেন এতক্ষণে। চেয়ারে ব'সে ব'সে তিনি দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, কান্তি অমায়িক গলায় কথা বলছে ও নির্বিকারে আঙুর খেয়ে চ'লেছে, থামছে না। অঢেল আঙুর তিনি আনেন নি, ঝুড়িটাও এমন-কিছু বড় ছিলোনা বা বোঝাইকরা ছিলোনা। কান্তিকে থামতে বলাও সঙ্গত নয়। কিন্তু একসঙ্গে এতগুলো আঙুর খেয়ে ফেললে হজম করা কঠিন হবে যে।

দেখেছ! কান্তি উঁকি দিলো আঙুরের দিকে: আমিই-যে প্রায় সাবাড় ক'রে দিলাম।

ভদ্রলোকটি করুণ মুখে যথাসম্ভব হাসি ফুটিয়ে ব'ললেন, খান্ না! তা'তে কি?

কৌমুদী ব'ললো, কমলা খান্। আবার লজ্জা দেখানো হ'চ্ছে! ন্যাশপাতি নিন্।

ভদ্রলোকটি কান্তির দিকে এগিয়ে দিয়ে ব'ললেন, এইটে খান্, খেয়েই দেখুন টেস্টটা! বাছাই ক'রে আনিয়েছি, একেবারে টাটকা জিনিষ।

কমলা ও ন্যাশপাতি খেয়ে কান্তি থামলো। শিকারী চেয়ারে হেলান দিয়ে অবশিষ্টাংশের পরিমাণ দেখার চেষ্টা করতে লাগলেন। কৌমুদীকে ব'ললেন, এবার দিই ছু'টো আঙুর!

কান্তি তখন পকেট থেকে কলম তুলে ব'ললো, বলুন কি লিখ্‌বো?

আমি কি জানি! লিখুন,—সম্পাদকমশায়, আপনার আচরণে আপনার ওপর বিশ্বাস হারিয়েছি, তাই অগ্রিম দক্ষিণা না পেলে উপন্যাসের বাকি অংশ পাঠানো সঙ্গত বিবেচনা করছিনা—

কান্তি খস্ খস্ ক'রে লিখ্‌ছিলো, ব'ললো, আস্তে। রচনা পাঠানো সঙ্গত—তারপর কি?

লিখুন, মনে করিনা।

আগে কি যেন বললেন? কান্তি কলম ঠোঁটের সঙ্গে ঠেকালো।

আপনি লিখ্‌বেন, আমি ডিক্‌টেট করবো? তা হয় না। নিজে লিখুন যা খুসি। কৌমুদী শিকারীর দিকে তাকিয়েও তাকালো না। ভদ্রলোকটি তখন সিলিঙের পাখা ঘোরা, নার্সের যাতায়াত, উড়ন্ত পর্দার বর্ণ-বৈচিত্র্য এবং কৌমুদীর মুখের চঞ্চল ভাবপরিবর্তন একই সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন।

সংক্ষিপ্ত চিঠিটা শেষ ক'রে কান্তি পকেট থেকে খাম বের ক'রে চিঠিটা পুরলো।

কৌমুদী বললো, ওই যে রামসিং। ওকে ডেকে দিয়ে দিন, গেটের সাম্নেই বাক্স আছে, ফেলে দেবে।

কিন্তু জুড়বো কি দিয়ে? থুতু দেওয়া আন্‌হাইজিনিক, বিশেষত হাস্‌পাতালে। একটু জলও রাখেন না এখানে? দেব আপনার মিক্‌শ্চার দিয়ে জুড়ে? ওষুধের শিশিটা কান্তি হাতে তুলে নিলো।

কৌমুদী ব'ললো, পাগোল হ'লেন নাকি?

কেন? ক্ষতি কি? যাক্‌গে, দিন্‌ তো মশাই একটা আঙুর, যদি কিছু মনে না করেন।

ভদ্রলোকটি অনুগতের মতো বিষণ্ণ মুখে তার দিকে আঙুর কয়টি এগিয়ে দিলেন। কান্তি একটি মাত্র আঙুর নিয়ে তার এক কোণ দাঁত দিয়ে কাটলো ও আঙুরটা খামের আঠার ওপর ঘ'ষে দিলো। সহাস্যে কৌমুদীর দিকে তাকিয়ে কৃত্রিমগর্বে ব'ললো, উপস্থিত বুদ্ধি।

শিকারী ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টি একটু করুণ হ'লো। কান্তির দিকে তিনি বিরক্ত চোখে মুহূর্তের জন্যে তাকিয়েই চোখ নামালেন।

রামসিং-এর হাতে খাম দিয়ে কান্তি আরাম ক'রে বস্‌লো। ব'ললো, আপনার সঙ্গে এতক্ষণ কথাই ব'লতে পারিনি। শুনেছি, আপনি একজন বিখ্যাত শিকারী। আমার একটি শিকার কাহিনী লেখার বড় সখ, একবার নিয়ে চলুননা আপনার সঙ্গে।

যাবেন! সংক্ষেপে জবাব দিলেন শিকারী।

কৌমুদী ব'ললো, আর শিকারে গিয়ে কাজ নেই!

শিকারী ভদ্রলোকটি এবার উঠ্‌লেন। আজ তাঁর মন বড় খারাপ হ'য়ে গেলো। কেন যেন, তাঁর বিকেলটা আজ বিস্বাদ মনে হ'চ্ছে। যাবার সময় তিনি কিছুই ব'লে গেলেন না। আজ দিয়ে দিন পাঁচেক তিনি এখানে এলেন, প্রত্যেক দিনই যাবার সময় আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েই যেতেন। আজ তিনি নীরবে চ'লে গেলেন।

কান্তি ব'ললো, মানুষের দুর্বলতা কোথায় লুকিয়ে থাকে বলা যায় না। চেহারা কি-রকম তেজী, শিকার করেন বাঘ, কিন্তু আপনার কাছেই কাবু। একটা ফল অন্তত আপনার মুখে দেওয়া উচিত ছিলো।

আমার ব'য়ে গেছে!

তা বললে চলবেনা কৌমুদী-দি, তাঁর চালচলন আপনি সহ্য করতে না পারেন, কিন্তু আপনার আচরণে তিনি যেন কষ্ট না পান্—এটা দেখা দরকার। বেচারা! তাঁর সব ফল আমি খেয়ে ফেললাম। আমার হয়ত মুণ্ডপাত করছেন তিনি! কান্তি প্রাণ খুলে হাস্‌তে গিয়েই থেমে গেলো: হঠাৎ তার খেয়াল হ'লো এটা যে হাস্‌পাতাল!

করুক্ গে যা-খুসি!

উঁহুঁ, তা বললে শুনছিনে। তাঁকে আনন্দ দিতে না পারেন—সেটা আপনার ইচ্ছে, কিন্তু কষ্ট দেবার অধিকার আপনার নেই। কেন দেবেন কষ্ট? আগে যদি আনন্দ দিতে পারেন, তাহ'লেই কষ্ট দেওয়ার অধিকার আসে। আনন্দও দেবেন না, কষ্টও দেবেন,—এটা অন্যায় আব্দার কিন্তু!

কষ্ট! এতেই কষ্ট! মনে মনে কৌমুদী হাস্‌লো। সাহু-দা তাহ'লে ভুজালীর কাহিনী-টুকু কান্তিকে বলেনি বুঝি! ভালো ক'রেছে। এটুকু অনুগ্রহ-যে সে ক'রেছে, এটা সাহুর মহানুভবতা নিশ্চয়ি। কোনো কথাই তো তার গোপন রাখার স্বভাব নয়, বিশেষত কান্তির কাছে।

কান্তি ব'ললো, ভদ্রলোকটির ধৈর্য দেখে আমি আশ্চর্য হ'য়ে যাচ্ছি। বাঘের আশায় ব'সে থেকে থেকে, আর-কিছু উপকার না হোক্, মন মজবুত হ'য়েছে। আমি ব'লতে পারি—ধৈর্যের পরীক্ষায় উনি নোবেল পুরস্কার পাবেন। (একটু হেসে) তা না হ'লে যার :কাছে ছোরা খেয়েছি, তার মোহ আজো কাটে না!

কৌমুদী হতাশ হ'য়ে পড়লো। সান্ত্বকে তাহ'লে সে ভুল বোঝেনি। কৌমুদীর নিজেরও-যে একটা উগ্রমূর্তি আছে, সে-কথা কান্তি জানলে তার আসে-যায় না। তবু তার একটু সংকোচ বোধ হ'লো। কান্তির দিকে ভালোমতো সে আর চাইলো না।

কান্তি ব'ললো, যাকে চাক্ষুষ দেখছি, তার ধৈর্যের তারিফ করছি বটে। কিন্তু আমাদের আড়ালে আর একজন ভদ্রলোক হয়ত ধৈর্যের দিক থেকে শিকারী ভদ্রলোকের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন।

কৌমুদী ব'ললো, সে আবার কে?

আপনি তাঁকে চেনেন না। কান্তি গম্ভীর হ'য়ে বললো: তাঁর নাম বিজনবাবু।

হাস্‌পাতালে হঠাৎ গাঢ় স্তব্ধতা নেমে এলো। কান্তি ঘুরন্ত পাখার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ ব'সে রইলো আর কৌমুদী কাৎ হ'য়ে শুয়ে তানপুরার আওয়াজ শুন্‌তে লাগলো।

কান্তি এবার উঠে পড়লো। কৌমুদীর দিকে তাকিয়ে সে কোনো কথা বলার উৎসাহ পেলোনা। হাস্‌পাতালের স্তব্ধতা ভেদ ক'রে শব্দহীন পায়ে সে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলো।

সিঁড়িতে সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা। কান্তি ব'ললো, চললেম।

তা তো দেখছি, এলে কখন?

ঘণ্টা দেড়েক আগে। অনেকক্ষণ কাটিয়ে গেলাম। কৌমুদী-দির মন খারাপ ক'রে দিয়ে তবে যাচ্ছি।

মন আবার খারাপ হ'লো কি সে? তাচ্ছিল্যের ভাবে সন্ধ্যা ব'ললো।

কান্তি ব'ললো, হঠাৎ বিজনবাবুর কথা ব'লে ফেলেছি। সত্যি, আমি আর আস্‌বো না, সন্ধ্যা। বিজনবাবুর খোঁজ পেলে আস্‌বো, নইলে

কৌমুদী-দির সঙ্গে আর দেখা কিছুতেই করবো না। আজ আমিও খুব লজ্জা পেয়েছি। সেদিন দম্ভ ক'রে ব'লে গেলাম, বিজনবাবুকে খুঁজে বা'র যদি কেউ করে তবে সে আমি, এই সব্যসাচী সেন।—কিন্তু, তিনি কি ভাবেন বলো তো!

ভাবে, না হাতি! ঠিকানা নেই, কিছু নেই—বা'র করলেই হ'লো? সন্ধ্যা সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে আরম্ভ করলো।

কান্তি ধীরে ধীরে নেমে গেলো।

সেদিনের পরে দু'মাসের ওপর হ'য়ে গেলো, কান্তি সত্যি আর আসেনি। কান্তির না আসার কারণ সাহুর কাছ থেকে কৌমুদী শুনেছে, ও দু'জনেই হেসেছে।

আমরা হাস্‌তে জানি ব'লেই-না বেঁচে আছি। মন নামক যে মারাত্মক জীবটি আমাদের মধ্যে অশরীরী দেহ নিয়ে বাস করে, তার ষড়যন্ত্রের হাত থেকে আমরা প্রায়ই রক্ষে পাই হাসির সাহায্যে। মন আছে ব'লেই আমরা মানুষ; মানুষের দেহ নিয়েও যাদের মন নেই, ভগবান তাদের পশুর শরীর দেন নি, এটা মস্ত আশীর্বাদ। তারা যদি না হাসে, তাদের বাঁচায় বিঘ্ন হয় না। চাঁদ হাসে না, চাঁদের মন নেই, তাই চাঁদ বেঁচে আছে। চাঁদ হাসে না, আমরা হাসি—আমাদের হাসির চোখে দেখি ব'লে মনে হয়, চাঁদের মুখে হাসি। আসলে চাঁদ কি হাসে? বলো তো পঞ্চমি, কবে তুমি চাঁদকে হাস্‌তে শুনেছ? তার গায়ের রং সূর্যের মতো প্রখর নয়, সোহাগার মতো শাদা আর কাদার মতো ঠাণ্ডা, তাই আমরা সোহাগ ক'রে বলি, হাসো তো চাঁদ॥ চাঁদ বেকুবের মতো গম্ভীর হ'য়ে আমাদের দিকে তাকায়, আমরা বলি, চাঁদ হেসেছে॥ হাসে না, তবু বাঁচে। আশ্চর্য লাগছে তোমার? আশ্চর্য হবার কিছু নেই, হাঁসও হাসে না, বাঁচে। কেন না, ওদের মন নেই। শরীরের মধ্যে মন ও ভাঁড়ারের মধ্যে ইঁদুর—

একই জিনিষ। মন আমাদের ভাবায়, আমাদের জিজ্ঞাসা করায়, আমাদের দিয়ে খোঁজায়; সব সময় আমাদের মধ্যে খুটখুট ক'রে আমাদের সচেতন রাখে। চেতনা দিয়ে আমাদের ব্যস্ত রেখে সে আমাদের অজ্ঞাতে আমাদের শরীরের সার চুরি ক'রে খায়। শরীরের ক্ষতি করলেও ক্ষতিপূরণ সে করে: আমাদের মানুষ করে। যারা ভাবতে জানেনা, পঞ্চমি, তাদের সুখ দেখে হিংসে ক'রোনা—তারা সুখী নয়, তারা সুখের প্রতারক!

কৌমুদীরা কান্তির কথা নিয়ে হেসেছে। এম্‌নি এক-একটা অছিলা নিয়েই আমরা হাসি। তুমি যখন আমার এ-চিঠি পড়বে, তখন তুমিও হয়ত হাস্‌বে।

সাহু স্বভাবতই ফুর্তিবাজ, হাসির মাত্রাও তার বেশি। কিন্তু আজ এখনো কৌমুদীকে ফিরতে না দেখে তার হাসি ক্রমশই ফিকে হ'য়ে আসছে। হাস্‌পাতালের বাইরে রুগী দেখ্‌তে যাওয়া কৌমুদীর আজ প্রথম নয়। এর আগেও অনেকবার সে গিয়েছে। কিন্তু এত দেরি কোনোদিন করেনি। গিয়েছে সেই বেলা ছু'টোয়, রাত্তির হ'তে চ'ললো দশটা। সন্ধ্যা ভয়ানক দুশ্চিন্তায় পড়লো। তার দুশ্চিন্তা ক্রম্‌শই চরমে উঠ্‌ছে। কোয়ার্টারে একা একা ব'সে থাকতে তার বিশ্রী লাগলো, হাসপাতালে আসার জন্যে রাস্তায় নেমে সে দেখ্‌লো ঝিরঝির বৃষ্টি হ'চ্ছে, মেঘও ডেকে উঠলো। কাপড়ের প্রান্তটি মাথায় তুলে সে কিছুটা এগোতেই বৃষ্টি সশব্দে ঘোরতর হ'য়ে নেমে এলো। বিদ্যুৎ চমকালো। অন্ধকারে মেঘ এ-ভাবে লুকিয়ে ছিলো, সে টের পায়নি। কোয়ার্টার থেকে হাসপাতালের রাস্তাটা এত লম্বা—সন্ধ্যা এর আগে তা জানতোনা। দৌড়তেও পারেনা, সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি আসতে লাগলো। খানিকটা এগিয়ে আসার পর সে সমুখে দেখ্‌তে পেলো, কে-যেন তীরবেগে গেট পার হ'য়ে ভেতরে ছুটে আসছে। সন্ধ্যার বুক হঠাৎ কেঁপে গেলো। সে বৃষ্টির মধ্যেই দাঁড়িয়ে পড়লো, লোকটা তার পাশ দিয়ে ছুটে

যাচ্ছিলো, বিদ্যুতের আলোতে সন্ধ্যা চিন্‌তে পেরেই ডাক্‌লো, কি রে কান্তিদা ?

কে, সন্ধ্যা ? কান্তি হাঁফাতে হাঁফাতে কাছে স'রে এলো, তার সর্বাঙ্গ ভিজে, মাথার চুল চোখে মুখে ঝুলছে, চুল গড়িয়ে জল পড়ছে, কান্তি ব'ললো, কৌমুদী-দি কই।

কেন বল্ তো। বুকে অজস্র আন্দোলন নিয়ে সন্ধ্যা ব'ললো, কি, খবর কি কান্তিদা ?

আছে। কৌমুদী-দিকে দরকার, কোথায় তিনি ?

বলছি। কি দরকার বল্ না আমাকে। সন্ধ্যা কান্তির কাঁধ ধ'রে ঝাঁকি দিলো।

কান্তি ঢোক গিলে ব'ললো, বিজনবাবুকে পেয়েছি।

সন্ধ্যা ব'ললো, আয়, এদিকে আয়, বারান্দায় উঠি গিয়ে।

যেতে যেতে কান্তি ব'ললো, তাঁর বুঝি এখন ডিউটি ? শিগগির ডেকে আন্ সন্ধ্যা ! খবরটা তাঁকে না জানানো পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।

বারান্দায় উঠে সন্ধ্যা ব'ললো, একেবারে ভিজে গেছিস্ যে !

তা গেছি। তুইও কম ভিজিস্‌নি। ডাক, ডাক, ওঁকে ডেকে আন্।

সন্ধ্যা ব'ললো, ডাকবো কি ? তার খোঁজেই তো এখন হাসপাতালে এলাম। সেই গেছে দু'টোর সময়, এখনো ফেরেনি।

কান্তি বললো, কল্‌এ গেছে বুঝি ?

হ্যাঁ, ডেলিভারি কেস্।

কৌমুদী তখন প্রকাণ্ড একটি বাড়ির চারতলার একটিমাত্র ঘরে নীরবে ব'সে বৃষ্টির শব্দ শুনছে। দৃঢ় হ'য়ে ব'সে আছে সে। মনে মনে সে সংকল্প করছে, বিচলিত সে হবেনা। দেখা যাক্, কি হয়। কৌমুদী প্রতীক্ষা করতে রাজি। দেয়ালে একটি বৌ-এর মস্ত ছবি তার দিকে তাকিয়ে হাসছে,

বৌ-টিকে কৌমুদী চেনে। দরজা দিয়ে তাকিয়ে সে দেখতে লাগলো অপরিসর ছাদটি। ছাদের তিনদিক উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, এক মানুষের চেয়েও উঁচু প্রাচীর। একদিকে এই ঘর। প্রাচীরের গায়ে গোটা তিনেক-গোলাকার ছিদ্র, বিদ্যুৎ চমকালে ছিদ্রগুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চেরাপুঞ্জিতেও এখন নিশ্চয় ভয়ানক বর্ষণ আরম্ভ হ'য়েছে।

কৌমুদী এখানে বন্দী হ'লো। এই উঁচু ছাদ, ছাদের মাথায় নীল আকাশটুকু। রাস্তা বা পথঘাট লোকজন গাড়িঘোড়া কিছুই দেখা যায় না এখান থেকে: প্রাচীর এত উঁচু। মাঝে মাঝে সে যখন দারুণ উতলা হ'য়ে ওঠে তখন ছিদ্রে চোখ দিয়ে কৌমুদী দাঁড়িয়ে থাকে। প্রাচীর উঁচুও যেমন, পুরুও তেমন। ছিদ্র দিয়ে হয়ত পাশের ছাদের চিলেকোঠা নজরে পড়ে, তার বাড়তি কিছু নয়। সারাদিন এখানে থাকে সে বন্দী, একজন লোকের দেখা পর্যন্ত মেলেনা। সময়মত গোলাপ এসে খাবার দিয়ে যায়। হাসি পায় কৌমুদীর। তার জীবন জুড়ে স্বধুই গোলাপ। গোলাপ তার সঙ্গে দরকারী ছাড়া আর কোনো কথাই বলেনা। এ-গোলাপের চেহারা গত-গোলাপের মতো অতটা নির্দয় ব'লে মনে হয়না। কৌমুদী হয়ত কখনো বলে, তোমার নামটি তো বেশ।

গোলাপ হয়ত উত্তর দেয়, ওই নামটুকুই মা। গুণ নেই একেবারে। তুমি খাও মা। না খেয়ে আর কতদিন কাটাবে? শরীর ঠিক রাখো। নাহ'লে যুঝবে কি করে?

তোমার বাবু কোথায়?

বলতে নিষেধ আছে। তুমি খাবে কিনা শুনতে চাই। তুমি খাওনা তা'তে আমার কি বলো তো! আমার মুখেও অন্ন রোচে না। ঠাকুরটা স্বধুই বলে, গুলাপ, তুই খাস্‌নে-যে একেবারে॥ বলি, শরীরে যুৎ পাইনে রে ঠাকুর॥ কোথা থেকে নিয়ে এনেছে তোমায় শুনি! খাও।

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

কৌমুদী কিছু মুখে দেয় অবশ্য, তবে সে না দেবার মতোই।

চারদিন কেটে যাওয়ার পর শিকারী ভদ্রলোক ওপরে এলেন, এসেই ব'ললেন, নাও সই করো একটা, করো। তোমায়-আমায় আজ বিয়ে হ'লো এ তারই কাগজ। করো সই। দুর্ব্যবহার করতে চাইনে, ভালো কথাই বলছি।

কৌমুদী কি-যেন ভাবলো, তারপর শিকারীর হাতের কাগজে একটা সই দিলো। কাগজ নিয়ে শিকারী নেমে গেলেন। তারপর আবার যখন ওপরে উঠে এলেন তখন মূর্তি তাঁর আলাদা।

ব'ললেন, ওই দেখ আমার স্ত্রী। তোমাকে দেখে হাস্‌ছে। ভারি দুষ্টু ও, তা জানো?

কৌমুদী ছবিটার দিকে তাকালো না, চুপচাপ ব'সে রইলো। একটু পরে বললো, আপনি আমাকে এ-ভাবে আটক করলেন কেন?

কৈফিয়ৎ দিতে পারবো না। তোমাকে আটক না ক'রে উপায় ছিল না। না হ'লে তুমি ধরা দিতে না। শিকারী ভদ্রলোক কৌমুদীর কাছে উঠে এলেন, গায়ের জামা খুলে বললেন, এই ছাখো সেই ছোরার দাগ। সঙ্গে এনেছ নাকি ছোরাটা?

না এনে কৌমুদী অন্যায়ই ক'রেছে বুঝি! সত্যাশ্রমের পথে সে-রাত্রে সেটা কোথায়-যে প'ড়ে গেছে, আজও কৌমুদী জানেনা। ব'ললো, দিন্ না একটা এনে।

আপনি নয়, তুমি। এই মাত্র সই ক'রে দিলে না?

বেশ, তুমিই না-হলো। কৌমুদী শিকারীর দিকে একটু তাকালো: আমাকে এভাবে ছলনা ক'রে নিয়ে এসে কত বড় বিপদ মাথায় নিয়েছেন, জানেন?

কোথায় তুমি হ'লো? বিপদ তো তুমি একটি সই দিয়ে সব উদ্ধার ক'রে দিলে, আবার বিপদ কোথায়? ছাখো, মেয়েমানুষের তেজ অলক্ষী। একটু ঠাণ্ডা হও। একটু ভেবে ছাখো।

ঠিক এই কথা কৌমুদী এর আগে একবার শুনেছে, ব'ললো, অনেক ভেবেছি, অনেক ভাবছি, কিনারা তো মিলছে না! আমায় আপনি ছেড়ে দিন্। কৌমুদীর গলার স্বর শেষের দিকে কেঁপে গেলো।

হুঁ! ছেড়ে দেব! শিকারী ভদ্রলোক একটি গুহার ভেতর থেকে আওয়াজ করলেন যেন: ছাড়ার জন্যে আনিনি। তুমি এখানে বন্দী থাকবে। যতদিন-না আমার নতুন বাড়িটা শেষ হয়, ততদিন এখানে থাকতে হবে। নতুন বাড়িতে তোমার জন্যে এমনি দোতলার ওপর আলাদা ঘর করাচ্ছি।

তার মানে সেখানেও এইভাবে বন্দী রাখ্‌তে চান? কারণটা আমায় জানাবেন? কি চান আপনি আমার কাছে? কৌমুদী শিকারীর দিকে পরিপূর্ণ তাকালো।

ভদ্রলোকটি ব'ললেন, কি চাই? তুমি ছেলেমানুষ নও, তুমি জান।

সে মুক্ত, এই অহংকারে কিছুদিন আগে কৌমুদী উচাটন ছিলো। আজ তার সে গর্ব চূর্ণ হ'য়েছে। আজ সে নেহাৎ বন্দী।

একটু ভেবে সে ব'ললো, জানি বটে। তবে সে আপনার দুরাশা। আমায় স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিন্, আমাকে ধ'রে রাখ্‌তে আপনি পারবেন না।

বিজ্ঞের হাসি হাস্‌লেন শিকারী, মহিম বাগচীর মুখে ঠিক এই হাসিই কৌমুদী একদিন দেখেছে। সেদিন সে ভয় পায়নি, কিন্তু আজকের কথা আলাদা।

গোলাপের ওপর কড়া আদেশ হ'য়ে গেলো কৌমুদীর ওপর কড়া পাহারা দেবার। মেয়েটার মন এখনো এখানে বসেনি। শিকারী হতাশ হ'লেন না। তাঁর ধৈর্য আছে। তিনি ঠিক করলেন, প্রতীক্ষা করবেন। সারাদিন

তদারক করে গোলাপ। রাত্রে অবশ্য শিকারী এই ঘরে থাকেন ও সারারাত কথা কাটাকাটি করেন। ফল কিছু হয় না। শারীরিক বল প্রয়োগ করার চেষ্টা তিনি করেন না, এ-চেষ্টা ক'রে তিনি ঠ'কেছেন। সারারাত প্রায় জেগেই কাটাতে হয় দু'জনকে।

তিনি দুঃখের গলায় বলেন, সারাটা দিন কাটাই নানারকম অশান্তিতে, নানারকমের শত্রু নিয়ে: পাওনাদার আর দেনাদারের মধ্যে। কত কটূক্তি শুনি! কতজন কত রকমে শাসায়! তোয়াক্কা করিনে। রাত্রে নিশ্চিন্তে একটু ঘুমবো, তারও উপায় নেই।

কৌমুদী নিজের বিছানা থেকে বক্র জবাব দিলো, শত্রুপক্ষ বুঝি অনেক? এ-ভাবে শরীর টিকবে না। কাল থেকে নিচে শোবেন। না হয় আমাকে নিচে পাঠাবেন—একান্তই যদি ছেড়ে না দেন্।

সকালে বিছানা থেকে উঠে ভদ্রলোকটি সর্বপ্রথম দেরাজ টেনে ক্ষুর সাবান বের করেন। অনেকক্ষণ ধ'রে দাড়ি কামান, তারপর কৌমুদীকে ছেড়ে নিচে নেমে যান। তখন গোলাপ আসে ওপরে কৌমুদীর তদারকে।

গোলাপ বলে, শরীর শুক্‌ন কেন? সারারাত বুঝি ঘুমোও নি? গোলাপের মুখে একটু রসিকতার স্বর ফোটে।

কৌমুদী বলে, ঠিক ধ'রেছ। তুমি আমাকে সাহায্য করবে গোলাপ? আমি পালাবো।

গোলাপ হাসলো, মন বস্‌ছেনা বুঝি? আমি সাহায্য করার কে মা? ফটকের নেপালী দ্বারোয়ানরা এক একটা যমদূত। বাবু তাদের নাকি কি-সব ব'লে রেখেছে।

তোমাদের বাবু বুঝি খুব কড়া?

আমাদের সঙ্গে আর ব্যবহার করে না। কি ক'রে বলি! গোলাপ একটু থামলো, তারপর ব'ললো, তুমি কে মা? তোমার ঘর কোথায়?

এই তো আমার ঘর। কৌমুদীও একটু থামলো।

যতক্ষণ গোলাপ থাকে, ততক্ষণ সে একটু ভাল থাকে। গোলাপ গেলেই কৌমুদীর মন আরো খারাপ হ'য়ে-যায়। গোলাপ চ'লে গেলে সে পথ খুঁজতে থাকে। চারতলা থেকে তেতলায় নামার পর্যন্ত হুকুম নেই তার। ঘরে সবসুদ্ধ চারটে জানলা, তার দু'টোই ছাদের দিকে, একটা বাথরুমের সঙ্গে, আরেকটা শিকারীর খাটের গায়ে ও একটু ওপর দিকে, সে জানলাটাও মাপসই বড় নয়। গোলাপের অবর্তমানে সে শিকারীর খাটের ওপর উঠে এই জান্‌লা দিয়ে বাইরে তাকায়। এ-জান্‌লা দিয়েও বিশেষ-কিছু দেখা যায় না, এই বাড়ির ফটক আর ফটকের দু'পাশে দু'টি ভুজালীবান্ যমদূত ছাড়া। খাটের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কৌমুদী সেই দৃশ্যই দেখে। এ-যেন নরক দেখে স্বর্গের দৃশ্য অনুমান ক'রে নেওয়া।

এদিকে কৌমুদী যতই বেঁকে বস্‌ছে, শিকারীও রুক্ষ হ'চ্ছেন সেই অনুপাতে। সিঁড়ির দরজায় তালা দিয়ে চাবি তিনি কাছে রাখছেন। কিন্তু সেটা প্রকাশ করছেন না। অথচ কৌমুদী তা জান্‌তে পারছে। এইভাবে দিন ও রাত্রি একের পর এক কেটে গেল অনেকবার।

তোমার মতলব কি বলো! শিকারী একদিন তা'কে চেপে ধরলেন: ধরা তুমি দেবে কি না!

কৌমুদী তাঁর থেকে তিন হাত তফাতে ব'সে ছিলো, সেখান থেকেই সে শিকারীর দিকে বক্র দৃষ্টি দিলো, ব'ললো, ঠাট্টার মতো শোনালো আপনার কথা।

যথা।

উদাহরণ দিতে হবে? কৌমুদী ব্যঙ্গের স্বরে ব'ললো, তবে শুনুন উদাহরণ। বনে ফাঁদ পেতে ধরা হ'লো একটা বাঘ। লোহার মোটা

মোটা শিক দিয়ে খাঁচা বানিয়ে তার মধ্যে তাকে পুরে তারপর বলা হ'লো : ধরা তুমি দেবে কি না!

খাসা উদাহরণ! বুঝেছি তোমার পাণ্ডিত্য। ভাখো, আর দু'দিন তোমাকে সময় দিলাম, এর মধ্যে যদি মত্ করলে, ভাল। তা না হ'লে আমাকে—

শেষ করুন্ কথা!

শিকারী ভদ্রলোক রেগে বেরিয়ে গেলেন।

ঘননীল আকাশ মাথার ওপর। ছোট্ট ওটা কি-যেন দেখা যাচ্ছে—এরোপ্লেন না চিল? পাড়াটা এত নিস্তব্ধ কেন? মানুষের মুখ না-হয় দেখা না-ই গেলো, গলার স্বর শুনতেও কি বারণ। কৌমুদী খাঁচায় বন্দী তাজা বাঘের মতো সারা ছাদ পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগ্‌লো। বনের গন্ধ এ-বাঘ এখনো ভোলেনি। মুক্তি নিশ্চয় তার চাই। শক্তি চাই, বিজনদা, শক্তি চাই! ছিদ্রে চোখ দিয়ে দাঁড়ালো কৌমুদী, পাশের বাড়ির চিলে-কোঠার মাত্র খানিকটা দেখা গেলো। নাঃ, সে ফিরে গেলো। পূব ছেড়ে পশ্চিমের ছিদ্রে চোখ দিলো, একটা কারখানার চোঙ্ দেখা গেলো কেবল, সঙ্গে একটু ধোঁয়া। শিকারীর তো এত শত্রু—শিকারী নিজেও স্বীকার ক'রেছেন, গোলাপও আভাষ-ইঙ্গিতে তা'কে ব'লেছে—তারা কি পারে না একটা ব্যবস্থা করতে? কোনোরকমে যদি শেষ ক'রে ফেলা যায়! তা না হ'লে তার বন্দীজীবনের অবসান হবে না।

কৌমুদী ঘরে গিয়ে খাটে উঠ্‌লো : নেপালী দ্বারোয়ান দু'টো ঝিমোচ্ছে, তীর বেগে একটা মোটর গাড়ি ঢুকলো, তার একটু পরেই পায়ে হেঁটে ঢুকলো একটা লোক—পরনে খাকির হাফ-প্যাণ্ট গায়ে খাকির শার্ট ও পুরু কোট। এত দূর থেকে ভালো ক'রে চেনা না গেলেও কৌমুদীর বুক এত জোরে কেঁপে উঠ্‌লো-যে তার দম আটকে যাবার মতো মনে হ'তে লাগলো।

কৌমুদী খাটের ওপর একটু ব'সে টাল সামলে নিয়ে আবার যেই উঠ্‌তে যাবে অম্‌নি বেলের পানা নিয়ে গোলাপের প্রবেশ।

গোলাপ, একটা কাজ করবি ভাই? তোর দু'টি পায়ে পড়ি। কৌমুদী খাট থেকে লাফিয়ে পড়লো।

সে কি কথা গো? কি কাজ এমন বলোই না আগে?

কৌমুদী বললো, বল্ করবি।

তিন দিন রেগে মেগে না খেয়ে আছ, আগে এটা খেয়ে নাও। তারপর শুনছি। গোলাপ বেলের পানা এগিয়ে দিলো।

কৌমুদী তার হাত থেকে পাথরের গেলাশটি টেনে নিয়ে এক নিশ্বাসে সবটুকু খেয়ে ফেললো, বললো, ছাখ্, খাকির প্যাণ্ট পরা গায়ে বেগ্‌নি কোট্ একজন ভদ্রলোক এইমাত্র এলেন, তাঁকে তুই চিনিস্ কিনা দেখে আয়।

তাগাদা কি? পুলিশের লোক নয়। পুলিশ-টুলিশ এ-বাড়িতে আসেনা বাপু। অত ভয় কিসের তোমার? তুমি দেখ্‌লে কোত্থেকে?

দেখে ফেলেছি ওই জানলা দিয়ে। না হোক্ পুলিশ, তুই যা ভাই। কৌমুদী গোলাপকে প্রায় ঠেলে দিলো।

গোলাপ ব'ললো, যাচ্ছি। আগে তোমাকে জল দিয়ে নিই।

জল থাক্। তুই যা। জল আমি নিয়ে নিচ্ছি। কৌমুদী নিজেই জল গড়াতে ব'সে গেলো।

কৌমুদীর এই ভাবপরিবর্তনে আশ্চর্য হ'তে হ'তে গোলাপ সিঁড়ি ভেঙে ধীরে ধীরে নামতে লাগলো। আর কৌমুদী গিয়ে উঠ্‌লো খাটে।

কৌমুদীর এখন যে রকম অধৈর্য অবস্থা, আমার চিঠি পাবার জন্যে তোমার অবস্থা নিশ্চয় অতটা অধৈর্য নয়। যদিও তুমি অভিমান ক'রে নিজে চিঠি না লিখে এবার তোমার এক বন্ধুকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছ। তিনি আমায় তোমার জবানীতে বার বার ক'রে টাঙাইলে যেতে লিখেছেন, আর

লিখেছেন—তোমার নাকি অবস্থা খারাপ। কৌমুদীর এখন যে-রকম অধৈর্য অবস্থা, এতটা খারাপ অবস্থা নিশ্চয় তোমার নয়। তুমি হয়ত এ-জায়গাটা প'ড়ে রাগবে, ভাববে, আমার কাহিনীর নায়িকার ওপর আমার দরদ যতটা, তোমার ওপর ততটা দরদ নয়। কথাটা ভুল নয়, পঞ্চমি। যা'কে নিয়ে আমি এই গভীর রাত্রে রচনা কাজে ব্যস্ত তার ওপর এতটা টান হওয়া অস্বাভাবিক নয়। চিঠিটা তাড়াতাড়ি শেষ করবো ব'লে রাত্রি জেগেও যখন লিখছি, তখন তোমার ওপর টানও কিছু কম নয় এমন। এ-কথা থাক্, কান পেতে শোনো—সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ। গোলাপ ফিরে এলো বুঝি।

পায়ের শব্দ শুনে কৌমুদীও খাট থেকে নেমে এলো। গোলাপ ব'ললো, উনি তো বাবুর বাড়ি তোয়ের করছেন। উনি ইনজিনীয়ারবাবু—ছোট ইনজিনীয়ার। ওঁর ওপর তিন তিনটে বাবু আছে। উনি কুলী খাটান আর দেখাশুনা করেন, মিস্ত্রীরা যা'তে না ফাঁকি দেয়।

নাম জানিস্?

নাম তো জানিনে মা। তবে, গায়না-বাজনায় ওঁর বড্ড নাম। আমাদের বাবু ওঁকে ভারি ভালোবাসে। গোলাপ মেঝের ওপর ব'সে পড়লো।

খুব গান-বাজনা করতে পারে বুঝি? শান্ত ও ধীরভাবে কৌমুদী ব'ললো।

কানে তো শুনিনি! তবে লোকে বলে! আমাদের ঠাকুর শুনেছে।

আচ্ছা গোলাপ, আমি যদি তোকে একটা চিঠি দি—তুই ওঁর হাতে পৌঁছে দিতে পারিস্? কৌমুদীও গোলাপের পাশে মেঝেয় ব'সে পড়লো।

গোলাপ আঁৎকে উঠ্‌লো: সে কি কথা গো? ওটি পারবোনা। নিমকহারামী কাজ আমায় করতে ব'লোনা মা। যার খাই, যার পরি, তার অনিষ্ট আমায় করতে ব'লোনা।

অনিষ্ট কি রে? ও-যে আমাদের দেশের লোক! গোলাপকে কৌমুদী বোঝাতে চেষ্টা করে।

গোলাপ ব'ললো, বুঝেছি। ওঁকে তুমি জানাতে চাও-যে তুমি এখানে আছ, যদি তা'তে কোনো হিল্লে হয়। তা'তে আমার বাবুর লাভ? আমাকে তিনি পাহারায় রাখ্‌লেন, আর আমিই কাটবো সিঁদ? আমি ও-কাজ পারবোনা মা।

এ-গোলাপও তো কম নির্দয় নয়! কৌমুদী একে তাহ'লে ভুল বুঝেছিলো বুঝি। এতদিন এত সহানুভূতি দেখিয়ে আজ তা'কে করছে প্রতারণা? গোলাপের ওপর কৌমুদীর ভারি রাগ হ'লো।

ব'ললো, উনি থাকেন কোথায়?

বেশি দূর না তো! বাবুর নতুন বাড়ির কাছেই তাঁবু খাটিয়ে থাকে। গোলাপ মন্তব্য করলো: ও-ও এক হতভাগা লোক। চুলোর দুয়োরে কেউ নাকি নেই, মানুষটাও আধপাগলা। ইনজিনীয়ার পড়ছিলো পাশ হয়নি, তাই এই দুর্গতি—পাশ হ'লে নাকি মস্ত লোক হ'তে পারতো।

দুর্গতি কিসের?

দুর্গতি নয় তো কী? ভদ্দরলোকের ছেলে, থাকে কুলীদের সঙ্গে, চলে ফেরে ওদেরি দলে। কুলীদের সঙ্গে ভারি ভাব নাকি! করবেই বা কি, কামায় না তো বেশি।

কৌমুদী উৎকর্ণ হ'য়ে শুনছিলো, ব'ললো এত খবর পেলে কোথায় গোলাপ?

সবাই বলে। একটু পাগলাটে কি না, সবার নজর তা-ই ওর ওপর।

কৌমুদী ব'ললো, তোদের বাবুদের বাড়ি হ'চ্ছে এখান থেকে কত দূরে?

দূর কি গো? ফটক দিয়ে বেরিয়ে সোজা চ'লে গেলেই ডানে একটা পার্ক, তার দক্ষিণে। কেন, এত খবরে দরকার কি গা? গোলাপ একটু বাঁকা চোখে তাকালো।

দরকার আবার কি? তুই দিয়ে আয় ভাই, দিয়ে আয় ভাই একটা চিঠি— তোর পায়ে পড়ি। কৌমুদী প্রায় তার পা-ই যেন ছুঁতে গেলো।

পাপের ভাগী ক'রোনা আমায়, ব'লে রাখছি। গোলাপ উঠে ছাতে চ'লে গেলো। সেখান থেকেই ব'ললো, বাবুকে আমি জানাব সব।

ভয় দেখাচ্ছিস্? কৌমুদী একটু হাসি মুখেই ব'ললো: বলিস্।

রাত্রে শিকারী ভদ্রলোক ব'ললেন, গোলাপ বুঝি চিঠি নিয়ে যেতে রাজি হ'লোনা? কিছুতে রাজি করাতে পারলে না ওকে? ইনিই তো তোমার খোঁজে গৌহাটিতে হোটেলে গিয়ে ম্যানেজারের দাবড়ি খেয়ে চ'লে আসেন! তাই না? এই বিজনই সেই বিজন বুঝি? কি, চুপ ক'রে রইলে কেন? কথা ব'লো।

কি ব'লবো বলুন!

এতটা বাড়াবাড়ি কেন করছো? জান্‌লে, সব জিনিষেরই মাত্রা আছে। তোমার জ্বালায় গোলাপ চাকরি ছেড়ে চ'লে গেলো আজ। ব'লে গেলো, তোমার কথা সে ঠেলতে পারেনা, আমার অনিষ্ট সে করতে পারেনা—এমন কাজের মধ্যে সে নেই। তা'কে কিছুতে রাখ্‌তে পারলাম না। গোলাপ তো গেলোই, তার সঙ্গে সঙ্গে গেলো আমার বিশ্বাসী ঠাকুরটাও। লোককে এত জ্বালাতন করার স্বভাব তুমি পেলে কোথায়?

ওটা হয়ত সংক্রামক রোগ। কৌমুদী ভেবে ব'ললো: আপনার কাছ থেকে পেয়েছি বোধ'য়।

তাই নাকি? শিকারী আজ প্রথম হো হো করে হেসে উঠলেন, হাসিটা বড় নিষ্ঠুর শোনালো। হাসি থামিয়ে ব'ললেন, এত বড় বিশ্বাসী ঝী আমার, তা'কে তুমি তাড়ালে?

চেড়িদের কেন সীতারা দিদি ব'লে ডাকেনা, এই আক্ষেপ ক'রে যদি রাবণেরা বুক চাপড়ায়, তাহ'লে বুঝতে হবে সীতারাই নেমকহারাম। তাই না? কৌমুদী এইটুকু বলে থামলো।

একটু হেসে কৌমুদী আবার ব'ললো, আপনার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি, আমায় ছেড়ে দিন্। আমায় যেতে দিন্। আমি এখানে থাকতে পারছিনে।

ওটা বাদে অন্ত কথা বলো। শিকারী অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের সঙ্গে ব'ললেন।

অন্ত কথা আমার জানা নাই। আমি চাই মুক্তি। এই আমার একমাত্র মন্ত্র এখন। অন্য কী কথা থাকতে পারে? অন্ত কোন্ কথা আপনি শুন্‌তে চান? রীতিমতো তেজের সঙ্গে বললো কৌমুদী।

শিকারীর মনের মধ্যে আগুন জলছিলো, আগুন চাপা দিয়ে তিনি তাপের সঙ্গে বললেন, কি কথা শুনতে চাই? কাগজ তুমি সই ক'রেছ যে-কথা বলার অধিকার নিয়ে।

বুঝেছি। আপনার দুরাশা সেটা, সে আপনার স্পর্দ্ধা। রাগে কৌমুদী হাঁফাতে লাগ্‌লো, ব'ললো, ব'লেছি তো, আপনি আমাকে কিছুতেই আটকাতে পারবেন না। আমি চাই স্বাধীনতা, মুক্ত আমি হবই।

আমিও একটু স্বাধীনতা চাই, পঞ্চমি। এতক্ষণ আমি যা লিখে এলাম—সবই নীলরতনবাবুর কাছে শোনা কথা। অবশ্য একটু পালিশ দিয়ে ও রং দিয়ে আমি তা-ই হুবহু লিখে গেছি। এতটা বাঁধাধরা রাস্তায় চলা অভ্যাস নেই, নিজের ইচ্ছেমত শেষটুকু লেখার তাগিদ ভেতর ভেতর অনুভব করছি। আমার এ প্রার্থনা মঞ্জুর করো।—

রাত্রে শিকারী একটু ধোপদুরস্ত হ'য়ে ওপরে এলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে কৌমুদীর আজ ভারি ভালো লাগলো। এতটা প্রশান্ত চেহারা এতদিন

ঢাকা ছিলো! জটিল কাব্যরচনায় মগ্ন কবির চোখের মতো তাঁর চোখে অতল গভীর স্তব্ধতা। তাঁর প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে বা'র হ'চ্ছে স্নিগ্ধ চন্দনের গন্ধ। এ কী প্রেমিক-রূপ শিকারীর! কৌমুদী কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। কৌমুদী খাটে ব'সে ছিলো, শিকারী ছিলেন দাঁড়িয়ে। শিকারীর ঠিক মাথার পাশেই তাঁর স্ত্রীর মুখটি দেয়াল থেকে উঁকি দিয়ে আছে। কৌমুদীর মনে গভীর সমবেদনা ফুটে উঠ্‌লো। পৃথিবীতে অনেক স্বামি-স্ত্রী সে দেখেছে, এতখানি মানান-সই এক জোড়া নারী-পুরুষ সে যেন দেখেনি। বড় আয়নায় শিকারীর ছায়া প'ড়েছে, বলিষ্ঠ ঘাড় ও প্রশস্ত কাঁধের ছায়া দেখে কৌমুদীর চোখ সেদিকে থেকে যেন ফিরলোনা। পলক না ফেলে অনেকক্ষণ কৌমুদী তাকিয়ে রইলো। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে দেয়ালের ছবিটার দিকে তাকাবার প্রবল ইচ্ছে হ'লো তার। কিন্তু বার বার দৃষ্টি পরিবর্তন করতে সে সংকোচ বোধ করলো। চন্দনগন্ধ ভেদ ক'রে মৃগনাভির গন্ধও যেন তার নাকে এসে প্রবেশ করছে। কৌমুদীকে দিয়ে আত্মসমর্পণ করিয়ে দেব নাকি, পঞ্চমি,—কি বল তুমি? কিন্তু তা সম্ভব কি ক'রে, তাহ'লে কৌমুদীর জীবনের শেষাংশ মিথ্যে হ'য়ে যায়। নীলরতনবটব্যাল-বর্ণিত কাহিনী তাহ'লে ওলট-পালট হ'য়ে যায়। কিন্তু এ-রকম একটি লোভনীয় অবস্থার মধ্যে দু'জনকে পেলে কলমকে সংযত রাখা কষ্টসাধ্য। লেখক হিসেবে জীবনে এমন হার অনেকবার হেরেছি, যা ভেবে ব'সেছি, যে-ভাবে কাহিনী মনে মনে গুছিয়েছি, পরে দেখা গেছে—তার কিছুই নেই; এক অপরিচিতা ব্যক্তিত্বশালিনী নায়িকা এসে আমার অজানিতে কখন্ সমস্ত কাহিনী একাই গ্রাস করে বসেছে। কিন্তু কৌমুদীকে দিয়ে খুসিমত কাজ করানো চলেনা। সে যে সেই মায়ের মেয়ে, যে তার-প্রতি-আসক্ত একটি ছেলেকে খুন ক'রেছে তার ডাক্তারের জন্যে। সেই কৌমুদীকে এতটা খেলো হ'তে দেওয়া শোভা পায় না।

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

শিকারী যখন কৌমুদীর পাশে এসে দাঁড়ালেন, তখনো কৌমুদী নড়লোনা। শিকারী তার কাঁধের ওপর একটা হাত রাখলেন, তখনো কৌমুদী অনড়। শিকারী কৌমুদীর পাশে ঘন হ'য়ে ব'সে বললেন, কেমন আছ ?

শিকারীর মুখে তীব্র মদের গন্ধ। কৌমুদী স্প্রীংএর মতো লাফিয়ে উঠ্‌লো, শান্ত হ'য়ে ব'ললো, এ কী ব্যবহার ?

শিকারী তার দিকে করুণ চোখে তাকালেন ও জড়িত জিভে ব'ললেন, রেগোনা।

স্তব্ধ ঘর। দু'জনেই চুপচাপ। চারতলার ছাদের ওপর দিয়ে বিকট আওয়াজ করতে করতে এরোপ্লেন উড়ে গেলো।

শিকারী কোনো কথা না ব'লে নেমে গেলেন। কৌমুদী নিশ্বাস ফেলে একটু হাল্কা বোধ করার আগেই শিকারী উঠে এলেন। তাঁর হাতে লেবেল-লাগানো বোতল।

তাক থেকে কাঁচের গেলাশ নামিয়ে পাশাপাশি রাখ্‌লেন। বোতল আর গেলাশ পাশাপাশি রাখায় দৃশ্যটা কৌমুদীর তুলনামূলক মনে হ'লো। শিকারী ও শিকারীর স্ত্রী ব'লে মনে হ'লো। গেলাশটি স্বচ্ছ ও নির্মল, বোতলটি গাঢ় কালো ও কদর্য। এই জঘন্য লোকটির সঙ্গে অমন স্ত্রী মানায় না, সেই জন্যই বুঝি বৌটা ম'রে গেছে। ভালোই হ'য়েছে। কিছুক্ষণ আগে এই স্বামি-স্ত্রীই আদর্শ যুগলমূর্তি ব'লে কৌমুদী ভেবেছিলো, কিন্তু সে কেবল সৌন্দর্যের সাময়িক প্রভাব।

ক্রমশ শিকারী নিজের আসল রূপ যতই প্রকাশ ক'রে ফেলছেন, ততই ঘৃণিত হ'চ্ছেন।

আজ শারীরিক বল প্রয়োগের দিন। শিকারী গভীর চিন্তা করতে করতে ধীরে ধীরে মদ খাচ্ছেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হ'চ্ছে, সাংঘাতিক জটিল এক গবেষণায় তার মন লিপ্ত। কৌমুদীও এদিকে চিন্তায় মগ্ন।

ওপরে আসার সময় তিনি সিঁড়ির দরজায় চাবি দিয়ে এসেছেন কি না উঠে গিয়ে দেখে এলেন। তারপর এলেন কৌমুদীর কাছে। কৌমুদীর পাশে তিনি বসতেই কৌমুদী উঠে গিয়ে গেলাশে মদ ঢেলে নিয়ে এসে তাঁর হাতে দিলো।

শিকারী বেশ ফুর্তি বোধ করলেন এতে। অত্যধিক আনন্দে তিনি কৌমুদীর কাঁধের ওপর হাত রাখতে গেলেন। কৌমুদীর মনে আক্রোশ মারাত্মক মূর্তি নিয়েছে। সে অনেকটা স'রে গিয়ে বললো, খেয়ে নিন্।

শিকারী ম্লান হেসে বললেন, খাবো? খাচ্ছি।

খান্। আরেকটু ঢেলে দিচ্ছি।

ঢেলে দেওয়া আর খেয়ে যাওয়া—দু'জনের জীবনের এই যেন ব্রত। অনেকক্ষণ ধ'রে এই ব্রতপালন চললো। এদিকে রাত্রিও বেড়ে চ'লেছে। চাঁদ এখন দূরের কারখানার চোঙা ডিঙিয়ে চারতলার ছাদের ওপর এসে পৌঁছে গেছে। সাড়াশব্দও নেই কোনো দিকে। যেখানে শব্দ নেই, চিন্তা সেখানে স্বভাবতই বেশি। শিকারীর মনের খবর তত রাখিনে, কিন্তু কৌমুদীর চিন্তা গভীর হচ্ছে ধীরে ধীরে। একটা দুরূহ কর্তব্য সাধনের দায়িত্বের ছাপ তার মুখে ক্রমেই স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠ্ছে।

শাদা আলোটা নিবিয়ে কৌমুদী নীল আলো জ্বেলে দিলো। ক্লান্ত ও অবসন্ন গলায় শিকারী ব'ললেন, এই বেশ। ব'সবেনা?

কৌমুদী উত্তর দিলোনা। তার ছাদে একটু পায়চারী করার ইচ্ছে হ'লো। মনের মধ্যে তার স্বাধীনতার সংকল্প তাকে চঞ্চল ক'রে তুলেছে। শিকারী তার বশে এসেছেন, এই ধারণা ক'রে সে সামান্য একটু স্বাধীনতা ভোগের ইচ্ছায় ছাদের দিকে পা বাড়ালো।

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

দরজা তখনো সে পার হয়নি, শিকারী লাফিয়ে উঠে পড়লেন, এবং বলিষ্ঠ হাতে কৌমুদীকে ধ'রে ফেললেন, ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, যাচ্ছ কোথায় ?

শান্ত ও সংযত ভাবে কৌমুদী ব'ললো, যাইনি। ছাদ থেকে একটু ঘুরে আসবো না ?

দৃঢ় জবাব দিলেন শিকারী : না, যাবে না।

বেশ, যাবো না! ফিরে এসে কৌমুদী খাটের ওপর সহজ ভঙ্গীতে বসলো। কিন্তু তার মনের মধ্যে তীব্রভাবে জাগলো প্রতিহিংসার ইচ্ছা।

এতদিন এতভাবে—গৌহাটিতে ও হাস্‌পাতালে—সে শিকারীকে অপদস্ত ক'রেছে, শিকারী তারি প্রতিশোধ নিচ্ছেন তার ওপর। তা কৌমুদী জানে। প্রতিশোধেরও প্রতিশোধ আছে। এ-ও কৌমুদী জানে। সহজ ভঙ্গীতে সে বস্‌লো বটে, অথচ মনোভাব তার সহজ থাকার কথা নয়।

মৃগনাভির গন্ধ বা চন্দনগন্ধ এখন পাওয়া যায় না। বাতাসের প্রত্যেকটি স্তর এখন মদ্যগন্ধে ছাওয়া। বিষাক্ত আবহাওয়ায় কৌমুদীর দম আটকে আসছিলো। ছাদ থেকে একটু নিষ্কলঙ্ক হাওয়া নিতেও তার বারণ। বেশ!

শিকারীর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কৌমুদী অনেকক্ষণ ব'সে রইলো। এটা সত্যি ঘুম, না, ঘুমের ছলনা! কৌমুদী গেলাশে ও বোতলে অযথা একটু শব্দ করলো, অযথা শব্দ ক'রে বিছানার ওপর হাত রাখলো। শিকারী নড়লেন না। নীল আলো নিবিয়ে শাদা আলো জ্বেলে দিলো— তবু তাঁর দিক থেকে কোনো সংকেত এলোনা। এবার কৌমুদী উঠে গিয়ে আয়নার সাম্নে বসলো, যেখানে ব'সে শিকারী দাড়ি কামান্। চেয়ার শব্দ ক'রে সরালো। তাকিয়ে দেখলো, শিকারী অকাতরে ঘুমোচ্ছেনই।

দেরাজ টানতে গিয়ে তার হাত কেঁপে গেলো। কিন্তু এ-সময় এমন দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবার মেয়ে কৌমুদী নয়।

কিছুক্ষণ পরে কৌমুদী পাগোলের মতো পায়চারী করতে লাগলো সারা ঘরময়। সে ভুলে গেলো-যে তাকে এখন এখান থেকে পালাতে হবে। আয়নায় নিজের ছায়া দেখে সে ভয় পেয়ে গেলো, তার ছায়া লক্ষ্য করে বোতলটা এত জোরে ছুঁড়লো-যে বোতল ও আয়না একই সঙ্গে ভেঙে পড়লো। এবার সে স্বাধীন বটে, এবার সে মুক্ত বটে। শাদা আলোর নিচে দু'টো হাত মেলে ধরতেই তার মাথা ঘুরে গেলো। আর নয়, এবার তাকে যেতে হবে। শিকারীর পকেট খুঁজে সে সিঁড়ির দরজার চাবি সংগ্রহ করলো।—

ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদ পেরিয়ে সে তালায় চাবি পাক দিলো। দরজা টান দিয়ে খুলতেই, একি, সম্মুখে সশরীরে সনাতন।

সনাতন ব'ললো, আমার সঙ্গে আয়।

কৌমুদী চললো।

পরদিন সকালে পাড়ায় সাড়া প'ড়ে গেলো। পুলিশের লোকে পাড়া জমজমাট। ওপরের ঘরে প্রথমে গিয়েছিলো নন্দ চাকর। সে-বেচারার বিপদ কম হ'লো না! কেন সে ওপরে গেলো, রোজ যায় কিনা, গিয়ে সে দৃশ্যটি ঠিক কি-ভাবে গ্যাখে তার নিখুঁৎ বর্ণনা তাকে দিতে হ'লো। সেখানে সে কৌমুদীকে দেখ্‌তে পায় না। সিঁড়িতে রক্তের দাগ দেখেই সে নাকি ওপরে ওঠে। এ-সব কৈফিয়ৎ দেবার পরও তার ছুটি হলোনা। পুলিশের পাহারায় তাকে ব'সে থাকতে হ'লো।

এতক্ষণও কৌমুদীর খোঁজ পাওয়া যায়নি। সকলে সন্দেহ করতে লাগ্‌লো, এই নতুন মেয়েটিই এমন ক'রেছে। কিন্তু তাদের ভুল ভাঙলো তখন, যখন তারা একেবারে একতলায় কোণের ঘরে কৌমুদীকে পেলো।

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

বেলা তখন অনেক, সারাবাড়ি খানাতল্লাসী করতে করতে এই ঘরটি ভেতর থেকে বন্ধ দেখা যায়। অনেক ডাকাডাকি ধাক্কাধাক্কিতেও সাড়া পাওয়া না গেলে সশস্ত্র পুলিশ চারদিকে মোতায়েম রেখে ঘরের দরজা কেটে ফেলা হ'লো। মেঝেতে কৌমুদীর মৃতদেহ। ঘরের আর কোনো প্রবেশপথ নেই। তাহ'লে এ বুঝি স্বেচ্ছামৃত্যু।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তারপর জানা গেছে, শিকারীকে হত্যা করা হ'য়েছে এবং মেয়েটি আত্মহত্যা ক'রেছে। কৌমুদীর আত্মহত্যা নাকি ভালোবাসার নিদর্শন। এ-অঞ্চলে তা-ই সকলের বিশ্বাস। শিকারীর শত্রুপক্ষদের ভেতর থেকে কেউ কেউ গ্রেপ্তার হ'য়েছে ইতিমধ্যে। এদের মধ্যে কেউ শিকারীকে হত্যা করায় কৌমুদী নাকি এত বড় কষ্ট সহ্য করতে না পেরে নিজেই নিজেকে খুন ক'রেছে। তার স্বীকারোক্তির কাগজ থেকেই প্রকাশ-যে মেয়েটি তার জীবনের যথাসর্বস্ব বর্জন ক'রে শিকারীকে পতিত্বে গ্রহণ ক'রে নিয়েছে। ভালোবাসা যদি এমন গভীরই না হবে, তাহ'লে এমন কথা কেউ নাকি লেখে না।

কিন্তু পঞ্চমি, আমি প্রথমেই তোমাকে ব'লেছি: তার এই আকস্মিক অপমৃত্যুর জন্যে অনেকে তা'কে বাহবা দিচ্ছে বটে, কিন্তু আমি সে-দলে যোগদান করতে পারিনে। ব'লেছি তো, আমার সন্দেহ হয়, সে আত্মঘাতী হ'য়েছে তার সীমাহীন পতিব্রতার জন্যে নয়, এ হচ্ছে তার স্বকৃত অপরাধের শাস্তি। আমার সন্দেহ হয় ব'লেই আমি তার জীবনের শেষাংশের কাহিনী স্বাধীনভাবে লিখে দিলাম। এখন তুমি যে-ভাবে খুসি মনে মনে গঠন করে নিতে পার বটে, সেটুকু স্বাধীনতা তোমার অবশ্যই আছে।

কৌমুদীর কথা শেষ হ'লো। এখন বিজন। বিজনকে এ বাড়িতে

আস্‌তেই হয়, তা তুমি জানো। সেদিনও সে এসেছিলো, মৃতদেহও সে দেখেছে। মৃতদেহটির ওপর যখন তার প্রথম চোখ পড়লো, তখন—

•

আর পঞ্চমী নয়। এবার হে পাঠক হে পাঠিকা! আপনাদের কাছে আমার একটি সংবাদ আছে। বিজনের কথা বলতে আরম্ভ ক'রেই আমি থেমে গেছি, আপনারা দেখেছেন। থেমে যাওয়ার কৈফিয়ৎ আমি এখানেই দিচ্ছি। গতকাল সন্ধ্যার সময় আমি যখন ঠিক ওই পর্যন্ত লিখেছি, তখন আমার লেখায় বাধা দেয় একটি টেলিগ্রাম। টেলিগ্রামটা টাঙাইলের। পঞ্চমীর মৃত্যু সংবাদ বহন ক'রে এনেছে। আজ একটা চিঠি পেলাম, চিঠিতেও ওই একই সংবাদ। আমারি ভুল হয়েছে, এখন বুঝতে পারছি। তার অসুখের খবর বা অবস্থা খারাপের খবর আমি তেমন বিশ্বাস করিনি অথবা বিশ্বাস করার সুযোগ পাইনি। আমি তখন লম্বা চিঠি শেষ করার জন্যে খুব ব্যস্ত। বহুদিন নীরব থাকার পর আচম্‌কা লম্বা চিঠিটা পাঠিয়ে তাকে তাক্ লাগিয়ে দেওয়ার মতলব ছিলো, কিন্তু সেই আমাকে তাক্ লাগিয়ে দিলো। তার স্বহস্তলিখিত শেষ চিঠিটার অভিসম্পাতের কথা ভেবে আজ ভীত হ'য়ে উঠছি। তার অভিশাপে আমাকে বুঝি ভুগতে হ'লো। দোষ আমার নয়, দোষ তার। এতদিন সে অপেক্ষা করতে পারলো, আর মাত্র দশটা দিন সময় চেয়েছিলাম, এ ক'টা দিন সে সবুর করতে পারলোনা! দশ দিন সময়ও আমার লাগেনি, সেদিনের পর গতকাল পঞ্চম রাত্রি গিয়াছে। আজ ষষ্ঠ দিন। দশ দিন অপেক্ষা করলে সে নিশ্চয় চিঠিটা পেয়ে যেতো। আজ যদি বাণ্ডিল বেঁধে পার্সেল করতাম, তাহ'লে কাল কিংবা পরশু সে পেতোই। আরও যে দু'টো দিন হাতে থাকতো তার মধ্যে পড়াও শেষ হ'য়ে যেতো। সে যাই হোক্, একটা উপন্যাসের জন্যে প্রকাশকের

শ্রীমতী পঞ্চমী সমীপেষু

তাড়া খাচ্ছি অনেকদিন থেকে। এই চিঠি থেকেই আপনারা সে খবর জান্‌তে পারবেন। চিঠি লেখায় ব্যস্ত ছিলাম ব'লে উপন্যাস লিখে উঠ্‌তে পারিনি। সময়মত আজ প্রকাশক এসে উপস্থিত—বাণ্ডিলটা তাঁর হাতেই দিয়ে দিলাম।

বাকি কথাটুকু এখানে সেরে নিই। বিজনের কাহিনীটা খুব ছোট। সে কৌমুদীর মৃতদেহ দেখে যখন চিন্‌তে পারে, তখন একটু এগিয়ে গিয়ে সে নাকি তার পাশে ব'সে গায়ে ঝাঁকি দেয় ও নাম ধ'রে ডেকে বলে: চেরাপুঞ্জিতে গেলেনা কেন॥ তারপর উত্তরের জন্যে এতটুকু অপেক্ষা না ক'রেই সে নাকি সেখান থেকে উঠে হন্‌হন্ ক'রে হাঁটা দেয়।